বিতর্কিত অসম্মতি
ধর্ষণ মামলার মেডিক্যাল এভিডেন্স ব্যবহার ও সংরক্ষণের সামাজিক সংকট

ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা

সময়টা আগস্ট ২০১১। এখনো স্মৃতিতে ভীষণ স্পষ্ট। আমার কর্মস্থল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে জেলা জজকোর্টের সিএমএম আদালতে সে সময়কার বহুল আলোচিত ভিকারুননিসা নূন স্কুলের শিক্ষার্থী ধর্ষণের বিচার কার্যকম শুরু হয়েছে। পত্রপত্রিকায় অনলাইনে ভিকি[১]র শিরোনামে ধর্ষক পরিমল নিয়ে প্রচুর লেখালিখি হচ্ছে, সরগরম অবস্থা। আমি সেই সিএমএম কোর্টে বাদীর চাচার সাথে বসে আছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম, সরকারি উকিলের পাশে ধর্ষক পরিমলের পক্ষে শুনানির দ্বিতীয় দিনে আইনি লড়াই লড়বার জন্য ১১ জন উকিল দাঁড়িয়ে আছেন। মামলায় অভিযুক্ত ধর্ষক পরিমল হাসি হাসি মুখ নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। ধর্ষণ মামলার শর্ত হিসেবে ভিকির সেই শিক্ষার্থীর মেডিক্যাল প্রমাণের কাগজপত্র আদালতে পৌঁছে গেছে।

১১ উকিলের প্রধান জন সামনে এসে মেডিক্যাল রিপোর্ট পড়তে শুরু করলেন। 'স্তন শক্ত ও গঠিত', উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি আর হাইমেন ৫ স্তরে ভেঙেছে। আমি শুনতে পেলাম উকিল সেই খোলা আদালতকক্ষে জোরে জোরে স্পষ্ট করে বলছেন, 'অনারেবল জাজ, পরিমল অভিযোগকারীর চাইতে লম্বায় খাটো। আর অভিযোগকারীর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নাই। সতীচ্ছদ একবারের যৌনসঙ্গমে কী এত ছিঁড়ে? এখানে পূর্বে মিউচুয়াল সেক্স হয়েছে, ইউর অনার!'

অভিযোগকারী শিক্ষার্থী ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মতো ঢাকার স্বনামধন্য স্কুলে পড়ে। তার জন্মসনদ বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় প্রদান করতে হয়েছে। আমি মেডিক্যাল রিপোর্টের কাগজটা হাতে নিয়ে প্রথমবারের মতো আবিষ্কার করলাম, শিক্ষার্থী তার বয়স ১৫ বছর বলেছেন। কিন্তু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের পরীক্ষক অভিযোগকারীর শরীরের গঠন, তার যৌনকেশের বাড়ন্ত অবস্থান, তার দাঁতের সংখ্যা, তার হাইমেন, তার যোনির ঘনত্ব, তার জরায়ু, পায়ুমুখ এসবের বেড় মেপে মেপে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে অভিযোগকারীর বয়স ১৬ বছর। রাষ্ট্রীয় জন্মসনদে নাগরিকের উল্লিখিত বয়স টপকে নারীশরীরের বিবিধ অঙ্গের মাপজোক করে ধর্ষিতার বয়স এক বছর বাড়িয়ে ১৬ বছর করে কী কী ধরনের আইনি ফায়দা কোন কোন সামাজিক এজেন্টের জন্য তৈরি হয় আর তাতে প্রভাবশালী ভাবনাগুলো কত কতভাবে বলীয়ান হয়— এই রাজনৈতিক চিন্তা মাথায় নিয়ে আমার আজকের এই প্রবন্ধ লেখার সূচনা।

এই প্রবন্ধ প্রধানত তিন ধরনের উপাত্তের ওপর দাঁড়িয়ে লেখা হয়েছে। একটি অংশে আছে ধর্ষিত নারীদের অভিজ্ঞতার বয়ান। 'অভিজ্ঞতায় ধর্ষণ, বহুমাত্রিক সহিংসতা এবং নারী জীবনের পুনর্গঠন' শীর্ষক আমার অপ্রকাশিত অ্যাকাডেমিক গবেষণার (কাজের সময় ২০০৫-২০০৭) জন্য রেকর্ডকৃত ধর্ষিত নারীর অভিজ্ঞতার বয়ানগুলো এই প্রবন্ধ রচনার প্রাথমিক তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্ষণের সার্ভাইভার নারীর মেডিক্যাল এভিডেন্সের প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতার কথাবার্তা আরো এসেছে আমার তৃতীয় বর্ষের অপ্রকাশিত গবেষণা কাজ 'মনের কাছাকাছি : শিশু যৌন নিপীড়ন বিষয়ে সহভাগিতামূলক গবেষণা কাজ' (কাজের সময় ২০০৪-২০০৫) এবং আইএসএস-এর উইমেন স্টাডিজ বিভাগের অধীনে 'লিভিং সেক্সুয়ালিটি : উইমেন ইন আরবান মিডল ক্লাস' শীর্ষক গবেষণার (কাজের সময় ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১০) নারীদের বয়ানের সূত্র ধরে। আমার নিজের বিগত এই তিনটি অ্যাকাডেমিক গবেষণা কাজের সময়কার সংগৃহীত নারীর বয়ানের রেকর্ডের অংশবিশেষ প্রবন্ধের সাথে সম্পর্কিত করে এই লেখায় তুলে আনা হয়েছে। অনার্স পর্যায়ের পূর্বোল্লিখিত গবেষণা কাজের একটি অংশ হিসেবে আমি ২০০৫ থেকে ২০০৭-এর জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশ্রয়কেন্দ্র, তাতে কর্মরত উকিল, সাইকোথেরাপিস্ট এবং বিএনডব্লিউএলএ-এর সাথে সম্পর্কিত ওসিসির চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেছিলাম। এই আলাপচারিতা ছাড়াও পরবর্তী সময়ে ২০১১-এর জুন মাস থেকে আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কিছু

[১] ভিকারুননিসা নূন স্কুলের শিক্ষার্থী ধর্ষণের সংবাদ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও অনলাইনে ভিকি নামে প্রচারিত হচ্ছিল। প্রচলিত ওই শব্দটি একই অর্থে এই লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে।

চিকিৎসক ও কিছু ইন্টার্নির সাথে এবং ঢাকার বাইরে ফরেনসিক বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ও স্টাফদের সাথে ব্লাস্টের সহযোগিতায় মতবিনিময়ের সুযোগ পাই। সে তথ্যগুলো এই প্রবন্ধে চিকিৎসক, উকিল ও মামলার বাস্তবতা সম্পর্কিত তথ্য হিসেবে কাজে এসেছে। এর বাইরে একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে ব্লাস্ট, বিএনডব্লিউএলএ এবং নারীপক্ষ— এই তিন সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তাদের রেকর্ডকৃত মামলার মেডিক্যাল এভিডেন্স, চার্জশিট এবং অভিযোগকারী নারীর কোর্টের অভিজ্ঞতার বয়ান। ব্লাস্টের সাথে ২০১১ সালের জুন থেকে 'স্বেচ্ছাসেবক গবেষক' হিসেবে যোগাযোগের সূত্রে আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুমতিসাপেক্ষে তাদের ৯ এবং ৭ ধারার অধীনে সংগৃহীত মামলার রেকর্ড আমার এই প্রবন্ধে সেকেন্ডারি তথ্য হিসেবে বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করেছি। সরবারহকৃত এই রেকর্ডেড মামলার ফাইল থেকে 'প্রণোদিত নমুনায়ন' (চৌধুরী গুলরুখ ২০০০) পদ্ধতিতে ২৫টি মামলার রেকর্ড বাছাই করে তথ্য হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে।

গবেষক হিসেবে আমি মনে করি, ধর্ষণ একটি বিদীর্ণ মুহূর্ত, যে সময় থেকে একজন নিপীড়িত তাঁর জীবনের সকল সিদ্ধান্ত ও বাস্তবতাকে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেখতে পান এবং তিনি ধর্ষণ পরবর্তী সময় থেকে তাঁর জীবনের সকল সম্পর্ক ও যোগাযোগকে ওই একটি ধর্ষণ ঘটনার মধ্য দিয়ে বারবার পুনর্গঠিত হতে দেখেন। এই গঠন একটি সামাজিক বাছাইয়ের অংশ মাত্র (শুভ্রা ২০০৯); আর তাতে 'একটা গোটা মানুষ আর মানুষ থাকে না, শুধুই যৌনাঙ্গ। অপমানের বোধটার মধ্যে শ্রেণী, সামাজিক ইতিহাস, পরিপার্শ্ব ধরে ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু ছোট হয়ে যাওয়ার সামাজিক অনুভূতিটা এক, সেটা মেনে নেয়া বা না নেয়া বা আপত্তি করা বা না করার উপর নির্ভর করে না' (চক্রবর্তী ২০০৪, সুলতানা ও ইসলাম ২০১১)। 'ধর্ষণ ভয় প্রদর্শনের সেই সচেতন প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে সমাজের সকল পুরুষ সমাজের সকল নারীকে একরকম ভয়ের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করে' (সুজান ব্রাউনমিলার ১৯৭৬)। এই বাস্তবতায় নারীশরীর পুরুষালি এজেন্টের ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি কার্যকর ক্ষেত্র বিধায় ক্ষমতা প্রদর্শনের হাত ধরে ধর্ষণ একটি বহুমাত্রিক নিপীড়নের চেহারা নেয়। নিশ্চুপকরণ, অবমূল্যায়নের সামাজিক প্রক্রিয়ার হাত ধরে নিপীড়ন নারীর ওপর পরতের পর পরতের চেহারা নেয়, বিবিধ নাজুকতা তৈরি করে দেয়। এই নিপীড়নের এজেন্ট কেবল ব্যক্তি ধর্ষক নয়, বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি আইন, রাষ্ট্র, চিকিৎসাবিজ্ঞানসমেত সমাজের সকল প্রভাবশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আর তাই ধর্ষণের নেতিবাচক বাস্তবতা কেবল নারীশরীরের নাজুকতার বাস্তবতা নয় বরং সামাজিক ও মানসিক সত্তার অবদমনের বাস্তবতা (শুভ্রা ২০১০)। এই বোঝাপড়াসমেত আমার এই প্রবন্ধ ধর্ষণ মামলায় ব্যবহৃত মেডিক্যাল এভিডেন্স স্বয়ং কীভাবে ধর্ষণকে ধারণ করে, তাতে কী কী পন্থায় নারীশরীরের পবিত্রতার প্রভাবশালী সামাজিক বোধ পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠা পায়, সেটাই দেখাবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

মনে রাখা জরুরি যে, আমি মোহান্তির সাথে একমত হয়ে মনে করি 'তৃতীয় বিশ্বের নারীর লড়াই অতিক্রমণের রাজনীতি নয় বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সার্বক্ষণিক যুক্ততার লেগে থাকার রাজনীতি' (মোহান্তি ১৯৯৮)। ফলে এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সার্বিক ধর্ষণ মামলার মেডিক্যাল প্রমাণাদি ও সনদের কোনো সর্বজনীন বাস্তবতা উপস্থাপনের চেষ্টা না-করে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্ষণের আইনি ব্যবস্থা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তারই যুক্ততার অংশ হিসেবে মেডিক্যাল প্রমাণের প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা করেছি মাত্র। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি দেখাতে চাইছি, যে কায়দায় ধর্ষণ মামলার মেডিক্যাল এভিডেন্সের নথিপত্র উৎপাদিত হয়, সেটি কী-কীভাবে অপরাধ এবং থানার সাথে যুক্ত হয়ে জ্ঞান ও অধিপতিশীল ক্ষমতার নানাবিধ কৌশলের যৌথতায় মামলার পরিবেশে নারীবিদ্বেষী প্রভাবশালী সামাজিক অসমতার ধারণাকেই পুনরায় বলবৎ করে, করবার রাস্তা খোলা রাখে এবং বারবার প্রশস্ত করে চলে। ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বয়ং যে সামাজিক ক্ষমতা ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিরাজমান আধিপত্যশীলের ক্ষমতাকে সমালোচনা করবার কোনো স্থান রাখে না (ফুকো ১৯৭৯, Connolly ১৯৯৩), সেটা বিশ্লেষণের একটি প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধের রাজনৈতিক আগ্রহের জায়গা। আমি মনে করি, অবশ্যই এই বিষয় একাধিক বিশদ গবেষণার দাবি রাখে।

ধর্ষণ মামলা এবং নারীবাদী 'আইনি' লড়াই

ধর্ষণের কারণ কী কী হতে পারে, পুরুষালি সমাজে কেন 'পুরুষ' এজেন্ট হিসেবে ধর্ষণ করে থাকে সে প্রসঙ্গে যেমন মনোবিজ্ঞানীরা বিবিধ ব্যাখ্যা হাজির করেছেন, তেমনি নারীবাদীরাও ধর্ষণ ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলেছেন। নারীবাদীদের মধ্যে ১৯৮৪ সালে জেফরিস ও রেডফোর্ড, ১৯৮৭ সালে এ্যাডলার ও

টেমকিন, ১৯৮৯ সালে গিনসবার্গ ও লারনার এবং ১৯৯৬ সালে সু এলিস দেখিয়েছেন, ক্রিমিন্যাল বিচার বিভাগের বিচারিক কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপে ধর্ষণ অপরাধ হিসেবে ক্রমাগত উপেক্ষিত হয়, অবমূল্যায়িত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে নারীবাদের এই রাজনৈতিক মোকাবেলার অংশ হিসেবে পশ্চিমা বিশ্বের নারীবাদীরা ১৯৭০-এর দশকে প্রথাগতভাবে ধর্ষণ সংজ্ঞায়নের সমস্যাগুলোর বিরোধিতা করেন এবং ধর্ষণ যে নারীর প্রতি পুরুষালি ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি রাজনৈতিক কৌশল, এর যে একটি লিঙ্গীয় সম্পর্কভিত্তিক রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে, সে বিষয়টি ১৯৭০-এর দশকের নারীবাদীরা তাঁদের আলোচনায় বারংবার উত্থাপন করে গেছেন। এই সময়কার নারীবাদীরা নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কাজ করে যান। এই সূত্রেই ১৯৮৪ সালে প্রথমবারের মতো লন্ডনে রেপ ক্রাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা পায়।

বৈশ্বিক এই বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ধর্ষণের বিচারবাস্তবতা একটি নিজস্ব আন্দোলনের পথ ধরে এগিয়েছে। মধ্য আশির দশকে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক সমালোচনা এবং ভিন্নমত প্রকাশকে কঠোর সেন্সরশিপ আইন প্রবর্তন করে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। গণমাধ্যমকর্মী এবং বুদ্ধিজীবীরা সেন্সরশিপের এই নীতিমালাকে এড়াতে মূলধারার 'রাজনৈতিক হিসেবে সেন্সরের অধীনে না পড়ে' স্বৈরসরকারকে সমালোচনার একটি পথ হিসেবে লিঙ্গীয় সম্পর্কভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। আর এর সূত্রেই সে সময়ে গণমাধ্যমে নারী নিপীড়ন নিয়ে এক ঝাঁক লেখা প্রকাশিত হয়। ৮০-র দশকে নারী নিপীড়নকে একটি ইস্যু হিসেবে দেখা হয়েছে এবং লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের কারণগুলোকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; যেমন মূলধারার রাজনৈতিক দল দারিদ্র্যকে নারী নিপীড়নের প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করেছে। অন্যপক্ষে বিরোধী দলগুলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রাষ্ট্র তথা সরকারের ব্যর্থতা এবং সার্বিক নৈতিক অবক্ষয়কে নারী নিপীড়নের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সে সময়েও বাংলাদেশের কিছু নারী সংগঠন নিপীড়নকে পুরুষালি সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করে দেখবার কথা বলেন। মোদ্দা কথা হলো, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ৮০-র দশকে ধর্ষণ তথা নারী নিপীড়ন একটি ইস্যুকেন্দ্রিক আলোচনার হাত ধরে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিসরে সামনে আসতে শুরু করে (গুহঠাকুরতা ১৯৯৮)।

৯০-এর দশকে বাংলাদেশের নারীবাদী বোঝাপড়া স্পষ্ট করে যে, পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন পরিবার কাঠামো, আইন, বিচারবিভাগ এমনকি রাষ্ট্র স্বয়ং নারীর চাইতে পুরুষকে এজেন্ট হিসেবে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত 'নাগরিকের' মর্যাদা দেয় (গুহঠাকুরতা ১৯৯৫)। অপরপক্ষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রেণিবৈষম্য নারীকে বহির্জগতে প্রান্তিক করে তোলে (ওয়েলবি ১৯৯৪)। আর এই দুইয়ের সংযুক্তিতে নারী যেমন অধিকতর অধস্তনতার অধীন থাকে, তেমনি পুরুষালি ভাবনা পুরুষালি এজেন্টকে চিরস্থায়ী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী নির্যাতনকে কৌশল হিসেবে ব্যবহারের সামাজিক শিক্ষা বহাল রাখে (শুভ্রা ২০০৮)। এই সময়ের নারীবাদী নানান লেখা এবং আন্দোলন ধর্ষণের সময় সাক্ষী থাকার বিষয়টিকে সমালোচনা করতে শুরু করে। নারীবাদী আন্দোলন কর্মীরা জানান দেন, বাংলাদেশের নারীরা একই সাথে ধর্মের জারিকৃত আইন এবং পাবলিক আইন, যেমন পেনাল কোড, উভয় আইনে কাঠামোকৃত হোন। এই দ্বৈতনীতি অনুসরণের ফলে বাংলাদেশের আইনব্যবস্থা প্রায়ই নারী নির্যাতনকে গোপন বা ক্যামোফ্লেজ করতে সফল হয়; যেমন ফৌজদারি আইনে তদন্তের পূর্বেই অনুমান করা হয় নারী তার পরিচিত পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনে অনুমতি দেয় (গুহঠাকুরতা ১৯৯৫)। ৯০-এর দশকের শেষের দিকে নারীবাদী আলোচনায় স্পষ্ট হয়, শাসিত মূল্যবোধের বাংলাদেশে শহর এবং গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই নারী নিপীড়িত হিসেবে যে আইনিব্যবস্থায় অভিযোগ তুলেন বা তুলে থাকেন, সেটি স্বয়ং পুরুষালি মতাদর্শের অসম লিঙ্গীয় মূল্যবোধ ধারণ করে। ফলে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত আইনগুলো এই বাস্তবতায় কেবল নির্যাতনের শাস্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু, সামাজিক মূল্যবোধ বিবিধ পন্থায় আইনকে 'পুরুষালি মূল্যমানসমেত' কার্যকর করে তোলে (শুভ্রা ২০০৯)।

বিশ শতকের প্রথম দিককার নারীবাদী আলোচনা নারী নির্যাতনকে মানবতার লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করে এবং জাতিসংঘসংশ্লিষ্ট সংস্থা; যেমন 'নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন' (CSW), 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO), প্রভৃতি

সংস্থার উদ্যোগে 'ধর্ষিতের স্বাস্থ্যগত সাহায্য ব্যবস্থাপনা'— এই শিরোনামে যে অধিকারগুলো[২] একজন নিপীড়িত ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত হয়েছে, সেগুলোকেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে।

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাস হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের পেনাল কোডের ৩৭৫ ধারা মোতাবেক ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা হতো। এই ধারা মোতাবেক একজন পুরুষ যদি কোনো নারীর সাথে যৌনসম্পর্কে যেত কেবল তখনই তাকে ধর্ষণ হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ ছিল। এই ধারাভুক্ত যৌনসম্পর্ক নারীর সাথে যদি (১) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়, (২) নারীর অনুমতি ছাড়া হয়, (৩) মৃত্যু ভীতি বা আঘাতের হুমকি প্রদর্শনপূর্বক যদি নারীর অনুমতি নেয়া হয় এবং (৫) ১৪ বছরের নিচে নারীর অনুমতি নিয়ে বা ছাড়া যেকোনো পর্যায়ে হয়। এই ধারায় ধর্ষণ বলতে কেবল যৌনমিলন বা যোনিতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানোকেই বোঝানো হতো। বৈবাহিক সম্পর্কের মাঝে স্ত্রীর বয়স ১৩-এর নিচে হলে তাকে ধর্ষণ হিসেবে ধরবার নির্দেশ ছিল। অন্যথায় বিবাহিতমাত্র স্বামী স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের অধিকারপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হতো। পরবর্তী সময়ে ৩৭৫ ধারার সাথে একটি বিশেষ ব্যাখ্যা যুক্ত করা পূর্বক ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ পাস করা হয়। এই ধারায় বলা হয়, যদি কোনো পুরুষ বিবাহবন্ধন ব্যতীত ১৬ বছরের অধিক বয়সী কোনো নারীর সাথে তার সম্মতি ছাড়া বা ভয়ভীতি দেখিয়ে বা প্রতারণামূলকভাবে তার সম্মতি আদায় করে বা ১৬ বছরের কম বয়সের কোনো নারীর সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করে, তাহলে উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য করা হবে (ধর্ষণচিত্র : ২০০০-২০০৪, ২০০৬, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ)।

এই আইনের আওতায় ধর্ষণ মামলা পরিচালনার কতগুলো ধাপ চিহ্নিত হয়, যার প্রথমে আছে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে থানার ইনচার্জ পুলিশ অফিসার (OIC)-এর কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। একে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (FIR) বলা হয়। যদি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ এফআইআর ফাইল করতে অস্বীকৃতি জানান, তবে অভিযোগকারী সরাসরি কোর্টে পিটিশন হাজির করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কোর্ট বিবেচনা করবেন যে, আসলে এই অভিযোগটি প্রাথমিক তদন্তের জন্য উপযুক্ত কি না। উভয় ক্ষেত্রে তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানা থেকে এফআইআর করা হোক বা পিটিশন হোক, থানার ইনচার্জ একজন তদন্ত অফিসারের ওপর তদন্তের ভার ন্যস্ত করবেন। আইও প্রথমে সরকার স্বীকৃত মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক অভিযোগকারীর মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। মেডিক্যাল পরীক্ষা ঘটনা ঘটার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করবার নির্দেশ রয়েছে। প্রশাসনিক কাগজপত্রের মধ্যে থাকবে কোর্টের আদেশনামা, ভিকটিমের পাসপোর্ট সাইজের ছবি, ভিকটিমের সম্মতিপত্র, আইনি-মেডিক্যাল পরীক্ষার পরীক্ষণপত্র। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৩২ ধারা মোতাবেক নিপীড়নের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে কিংবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বেসরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের ওপর দ্রুত সম্পন্ন করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত কোনো হাসপাতালে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য উপস্থিত করা হলে উক্ত হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার মেডিক্যাল পরীক্ষা অতি দ্রুত সম্পন্ন করবেন এবং উক্ত মেডিক্যাল পরীক্ষাসংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে এবং এরকম অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি স্থানীয় থানাকে অবহিত করতে হবে।

এই নির্দেশের ধারাবাহিকতায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাসের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার এবং ডেনমার্কের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ অর্থায়নে ২০০০ সালের মে মাসে বিভাগীয় পর্যায়ে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (OCC) প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা পায়। এই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারাদেশে সহিংসতার শিকার ভিকটিম, বিশেষত ধর্ষণ ও অ্যাসিডদগ্ধদের মেডিক্যাল পরীক্ষাসংক্রান্ত একটি ফরমেট প্রণীত হয়। এই পরিপত্রের নির্দেশাবলি মতে ধর্ষিত নারী থানায় মামলা না-করলেও কর্তব্যরত চিকিৎসক ধর্ষিতাকে চিকিৎসা সেবা দিতে বাধ্য থাকবেন। ফলে ১৯৯৮ সালের কোর্ট আদেশ

[২] অধিকারগুলো হলো : স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার, মানবিক মর্যাদা রক্ষার অধিকার, সকল প্রকার বৈষম্যমুক্ত থাকার অধিকার, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার, নিজের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার (Clinical management of rape survivors: Developing protocols for use with refugees and internally displaced persons, 2004)।

মোতাবেক ধর্ষিতার ওপর মেডিক্যাল পরীক্ষা করবার পূর্বে থানায় এফআরআই করা বাধ্যতামূলক করবার আইন আর বলবৎ রইল না। উপরন্তু, থানা, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করাবার বিষয়টি আইনি জটিলতা পার হয়ে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। এই পরিপত্রে ধর্ষণ মামলার জন্য মেডিক্যাল প্রমাণাদি সংরক্ষণের একটি আদর্শ ফরমেট সকল সরকারি এবং সরকারস্বীকৃত চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত হয়। অর্থাৎ এই ফরমেট বা কাঠামোর মাধ্যমে সারাদেশের সকল পর্যায়ে মূলত ধর্ষণ মামলার মেডিক্যাল প্রমাণ সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়। এই ফরমেটে রয়েছে :

১. ভিকটিমের বেসিক শারীরিক বিবরণ;
২. অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা;
৩. মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য ভিকটিমের প্রদেয় সম্মতি। এই সম্মতির জন্য সাক্ষী দিবেন অপর দুই ব্যক্তি;
৪. পরীক্ষার সময় ও তারিখ;
৫. নারী সহকারীর নাম ও ঠিকানা;
৬. ঘটনার বিবরণ— বিশেষত ঘটবার সময় ও তারিখ, স্থান ও ঘটনার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা;
৭. শরীরী গড়নের পরীক্ষণ— ওজন, উচ্চতা, দাঁতের গঠন;
৮. শনাক্তকরণ চিহ্ন;
৯. বলপ্রয়োগের কোনো চিহ্ন।

ধর্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্দেশিত বিষয়াবলি

১. রজঃচক্রের বিবরণ;
২. বৈবাহিক অবস্থা;
৩. সন্তানের সংখ্যা;
৪. যৌনকেশের বিবরণ;
৫. স্তনের গঠন ও প্রকৃতি;
৬. পেটের গড়ন;
৭. যৌনাঙ্গের সবিশেষ বিবরণ, যার মধ্যে আছে যোনিছিদ্র, যোনিবেড়, যোনিপথের বিবরণ, আর এই পরীক্ষণের জন্য টু ফিঙ্গার টেস্ট সম্পাদিত হয়;
৮. এক্স রে, আলট্রাসনোগ্রাফি, প্যাথোলজিক্যাল এবং ডিএনএ পরীক্ষা;
৯. চিকিৎসান্তে অবমুক্তির তারিখ ও সময়;
১০. উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য কোনো হাসপাতালে প্রেরণের পরামর্শ;
১১. পরীক্ষক/চিকিৎসক-এর পরামর্শ ও মন্তব্য;
১২. পরীক্ষক চিকিৎসকের স্বাক্ষর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর।

মেডিক্যাল পরীক্ষণের এই পরিপত্রের সবচাইতে কার্যকর দিক হলো, পরীক্ষণের সাথে ভিকটিম নারীর সম্মতির বিষয়টিকে এটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে বলে এবং চিকিৎসক ভিকটিম নারীকে পরীক্ষণের পন্থা সম্পর্কে জানাতে বাধ্য থাকেন। আইনি বিধানের এই বাস্তবতায় পুলিশি এজাহার মতে গড়ে প্রতিবছর ৩,৩০০ জন ব্যক্তি ধর্ষণের ভিকটিম হয়ে থাকলেও (আহমেদ ২০১১, রোজারিও ২০১১) ২০০৯ সালে সারাদেশের উপজেলা পর্যায়ে মাত্র ৩টি ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে (নারীপক্ষ ২০১০)। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিধি মোতাবেক পরিপত্রের দিকনির্দেশনা ও ফরমেট— এ দুটির কোনোটাই সকল জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা হয় না এবং কেবল জেলা পর্যায়েই ভিকটিম নারীর মেডিক্যাল সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে (এস এম রোজারিও ২০১১)। প্রমাণাদি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রক্রিয়াগুলোর একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিবরণ এ পর্যায়ে হাজির করা হলো :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা।

নং-স্বাঃঅঃ/প্র-৩/নাঃ ও শিঃদের মেডিঃপরীক্ষা/চিঃসংক্রান্ত/০৫/ ২৫০৭৫ (১৫০) তারিখ- ০৬/৩/০৭

বরাবর

১। অধ্যক্ষ

----------------, মেডিকেল কলেজ ------------।

২। পরিচালক

------------- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ---------------।

৩। তত্ত্বাবধায়ক (সকল)

---।

৪। সিভিল সার্জন (সকল)

---------------------। উক্ত ফরমেটটি আপনার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান সমূহে জারী করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিষয় ঃ সহিংসতার শিকার ভিকটিমের মেডিকেল পরীক্ষা / চিকিৎসা সংক্রান্ত ফরমেট সারাদেশে জারীকরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ স্বাপকম/জিআই-১৯/৯৭(অংশ)/৬, তারিখ-২৫/২/০৭ ইং।

উপরোক্ত বিষয়ে বর্নিত সূত্র মারফত প্রাপ্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ' সহিংসতার শিকার ভিকটিমের আইনানুগ মেডিকেল পরীক্ষার প্রতিবেদন সংক্রান্ত ' একটি ফরমেট এতদসংগে প্রেরন করা হইল। উক্ত ফরমেট অনুযায়ী সহিংসতার শিকার ভিকটিমের আইনানুগ মেডিকেল পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইল।

সংযুক্ত: ৪ (চার) পাতা।

০৬/৩/০৭

(ডাঃ মোঃ মোজাফফর হোসেন)
পরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

নং-স্বাঃঅঃ/প্র-৩/নাঃ ও শিঃদের মেডিঃপরীক্ষা/চিঃসংক্রান্ত/০৫/ তারিখ-

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরন করা হইলঃ

১। সিনিয়র সহকারী সচিব (জেন্ডার ইস্যুজ শাখা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(ডাঃ মোঃ মোজাফফর হোসেন)
পরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

P-1

ভিকটিমের আইনানুগ মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রতিবেদন ফরম *(পৃষ্ঠা ১)*

ভিকটিমের
সত্যায়িত ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভিকটিমের আইনানুগ মেডিকেল পরীক্ষার প্রতিবেদন

স্মারক নং- তারিখ-

সূত্র ঃ

১। মেডিকেল পরীক্ষা/ চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

ভিকটিমের পরিচয় ঃ

ক) নামঃ ----------

খ) বয়স (ভাষ্যমতে) ---------- গ) লিংগ ----------

ঘ) ধর্ম ঃ ---------- ঙ) পেশা ----------

চ) পিতা / মাতা / স্বামীর নাম ঃ ----------

ছ) ঠিকানা ঃ ----------

৩। সনাক্তকারী / আনয়নকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

P-02

৪। সম্মতি ঃ ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল আমার পক্ষে বা বিপক্ষে হতে পারে জেনে আমি আমার গোপনংগসহ সর্বাংগ ডাক্তারী পরীক্ষা করতে রাজি আছি / রাজি নই।

স্বাক্ষী ঃ

১।

২।

ভিকটিমের স্বাক্ষর বা টিপসই

ভিকটিমের আইনানুগ মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রতিবেদন ফরম *(পৃষ্ঠা ২)*

৫। পরীক্ষার দিন, তারিখ ও সময় ঃ --

৬। উপস্হিত মহিলা সহকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ --

৭। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (ভিকটিমের ভাষ্যমতে) ঃ

ক) ঘটনাস্হল --

খ) ঘটনার দিন, তারিখ ও সময় --

গ) ঘটনার বিবরণ ঃ --

৮। দৈহিক পরীক্ষার বিবরণ ঃ

ক) দৈহিক গঠন ঃ --

খ) উচ্চতা ঃ ------------------------------------ গ) ওজন ঃ ----------------------

গ) দন্ত বিন্যাস ঃ------------------------------------ ঙ) মোট ঃ----------------------

৯। সনাক্তকরন চিহ্ন ঃ

ক) --

খ) --

১০। যখমের জবরদস্তির বর্ণনা ঃ

ক)

খ)

গ)

১১। এসিড বা অগ্নিদগ্ধ ঃ --

১২। যখমের বয়স (সম্ভাব্যক্ষেত্রে) ঃ --

১৩। ব্যবহৃত অস্ত্রের ধরণ ঃ

১৪। যখমের প্রকৃতি ঃ ক) সাধারণ যখম, খ) মারাত্মক (Grievous) যখম

১৫। ভিকটিমের মানসিক অবস্হা ঃ --

১৬। যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ঃ

ক) মাসিকের বিবরণ ঃ

১. প্রথম মাসিক ---------------------------- ২. সময় কাল ঃ----------------------

২. শেষ মাসিক ঃ ---------------------------- ।

খ) বৈবাহিক অবস্হা ঃ অবিবাহিত / বিবাহিত / বিধবা / বিচ্ছেদপ্রাপ্ত / স্বামী পরিত্যক্তা

গ) সন্তান সংখ্যা ঃ ---------------------------- ।

ঘ) শেষ সন্তানের বয়স ঃ ---------------------------- ।

P-03

ভিকটিমের আইনানুগ মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রতিবেদন ফরম *(পৃষ্ঠা ৩)*

ঙ) কেশ বিন্যাস ঃ

১. বগলের কেশ ঃ ----------

২. যোনীদেশ কেশ ঃ ----------

৩. স্তন ঃ

৪. গঠন ঃ ক. এখনও গঠিত নহে, খ. গঠিত হয়েছে

গ. সুগঠিত, ঘ. সুগঠিত ও বড়, ঙ. ঝুলন্ত

২..প্রকৃতি ঃ ক. নরম, খ. শক্ত , গ. স্থিতিস্থাপক

৩. স্তনাগ্ন (Nipple) ঃ ---------- ।

৪. স্তনাগ্ন পাদদেশ (Areola) ঃ ---------- ।

ছ) পেট (Abdomen) ঃ ---------- ।

জ) যৌনাংগ এলাকা ঃ

১. বহিযৌনাংগ (Vulua) ঃ ----------

Mons Pubis ঃ ----------

Labia Majora ঃ ----------

Vestibule ঃ ----------

৫. সতীচ্ছেদ (Hymen) ঃ ----------

৬. যোনী পথ (Vaginal Canal) ঃ ----------

৭. যোনী বেড় (Fourchette) ঃ ----------

৮. জড়ায়ু গ্রীবামুখ (Cervix) ঃ ----------

৯. পায়ুপথ (Rectum) ঃ ----------

১৭। বিভিন্ন পরীক্ষা ঃ

ক) এক্স-রে পরীক্ষা ঃ ----------

খ) আল্ট্রাসোনোগ্রাফী পরীক্ষা ঃ ----------

গ) প্যাথলজি (ভেজাইনাল সোয়াব) পরীক্ষা ঃ ----------

ঘ) ডি. এন. এ পরীক্ষা ঃ ----------

ঙ) অন্যান্য পরীক্ষা (প্রয়োজনক্ষেত্রে) ঃ ----------

১৮। প্রদত্ত চিকিৎসা / পরামর্শ ঃ

ধর্ষণের মেডিক্যাল প্রমাণাদির সনদ ও ধর্ষিতের ধর্ষণ বাস্তবতা

ধর্ষণ মামলার মেডিক্যাল এভিডেন্স মামলা পরিচালনা এবং মামলার জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশাল ভূমিকা রাখে। এর একটি কারণ হলো, মামলা পরিচালনা করবার সময় যদি মামলার বাদী মেডিক্যালের প্রামাণিক সনদ না-পেয়ে থাকেন, তবে উকিল বা আইনি ব্যবস্থাপনায় বাদী এবং ভিকটিমকে ধর্ষণঘটনার সাক্ষী হাজির করতে হবে। ব্লাস্টের গবেষণায় দেখা গেছে, নিম্ন এবং উচ্চ উভয় আদালতে মামলা চলাকালে যখন কিনা মেডিক্যালের সনদ খুব স্পষ্টভাবে ধর্ষণের কথা ঘোষণা না-করে বা ধর্ষণের সনদ সুস্পষ্ট না-থাকে, তখন মামলার বিচারক অনেক সময় সাক্ষীদের ওপর গুরুতরভাবে নির্ভর করতে পারেন না। উপরন্তু, ধর্ষণের সময় সাক্ষী উপস্থিত থাকাটা খুবই বিতর্কিত বিষয়। অপরপক্ষে, মামলায় যখন মেডিক্যাল সনদে ধর্ষণের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে, সে মামলায় বিচারক এবং আইনি পরিবেশ ধর্ষিত নারীর প্রতি আপেক্ষিকভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাবার সম্ভাবনা রাখে বা অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে (রোজারিও ২০১১)। আইনি ব্যবস্থাপনায় কোনো অপরাধ সাব্যস্ত হবে কি হবে না সেটা নিশ্চিত করবার জন্য মেডিক্যাল প্রমাণের সনদ কৌশলগতভাবে মূল চাবিকাঠি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মেডিক্যাল প্রমাণ স্বয়ং বিচারকের কাছে ধর্ষণের সার্ভাইভার ও ধর্ষকের ভাবমূর্তি তৈরি করে চলে (শুভ্রা ২০১০)।

এই প্রক্রিয়ায় ধর্ষণ মামলায় সমাজের একজন নারী যখন ধর্ষিত হিসেবে বিচার চাইছেন আর অভিযুক্ত হিসেবে যখন সমাজের লিঙ্গীয় সম্পর্কে অধিপতিশীল পুরুষালি এজেন্ট তার সাথে আইনি লড়াই করছেন, তখন এই অপরাধ সাব্যস্তের দরকষাকষির পুরো প্রক্রিয়ায় ধর্ষণের সামাজিক নেতিবাচক ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। জড়িত থাকে বলে সামাজিক নানান এজেন্ট মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে, ক্ষমতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে, সামাজিক অর্থময়তা তৈরির মধ্য দিয়ে মেডিক্যাল এভিডেন্স সংরক্ষণের বিবিধ পন্থায় নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে থাকে। এই প্রভাবগুলোর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রায় ৮৮ শতাংশ দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগকারী ধর্ষিতা অভিযুক্ত ধর্ষকের চাইতে সামাজিকভাবে অধস্তন অবস্থানের হয়ে থাকেন (নারীপক্ষ ২০১০, রোজারিও ২০১১, আসমিতা ২০১২)। এই প্রেক্ষিতে ধর্ষণ মামলার মেডিক্যাল প্রমাণাদি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সামাজিক সংকটের সাথে ধর্ষিত ও ধর্ষকের এবং ধর্ষণের সামাজিক অর্থের আন্তঃসম্পর্ককে মাথায় রাখাটা জরুরি মনে করি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যখন নারী হিসেবে কেউ ধর্ষিত হচ্ছে, তখন তার সমাজকাঙ্ক্ষিত শরীরী 'আদর্শ শুচিতা'র ধারণা ভেঙে যাওয়ার বা না-থাকার সামাজিক প্রেক্ষিত তৈরি হয়। ধর্ষিত মানেই হচ্ছে সামাজিকভাবে কেউ আসলে শরীরীভাবে আর ঠিক 'কামনার নারী' নয় বা তাকে ঠিক 'আদর্শ নারী' ভাববার জায়গাটা নেই (শুভ্রা ২০১০)। এই বাস্তবতায় একজন নারী ধর্ষণের সার্ভাইভার হিসেবে যখন মামলা দাঁড় করান এবং মামলায় জয়ী হয়ে যান, তখন তিনি সামাজিকভাবে নেতিবাচক 'ধর্ষিতা'র লেভেল আইনিভাবে পেয়ে যাচ্ছেন আর সেটা কোনোভাবেই সমাজকাঙ্ক্ষিত বা সমাজের 'ভালো চোখে দেখার মতো কিছু নয়' এবং এই পরিচয় 'নারী'র জন্য সামাজিকভাবে সবসময় কোনোভাবেই আরামদায়ক পরিক্ষেত্র তৈরি করে না। উপরন্তু, মামলায় অভিযোগকারী ধর্ষণের সার্ভাইভার নারী যদি ধর্ষণ মামলায় হেরে যান, তাহলে তিনি আইনের মাধ্যমে সেই চূড়ান্ত 'নেতিবাচক নারীদের' একজন হিসেবে প্রমাণিত হোন, যিনি আসলে ধর্ষণের মতো অপরাধকে পুরুষ ফাঁসানোর জন্য ব্যবহার করছেন; এবং তিনি সেই 'ভণ্ড' নারীর লেভেল পান, যে নারী নিজের 'ইজ্জত'-এর ওপর 'খেলে' অপরপক্ষের 'পুরুষ'কে ছলচাতুরী করে 'অসৎ' মিথ্যে মামলার অভিযোগে 'সামাজিকভাবে অসম্মানিত' করতে চেয়েছেন। পরিশেষে ধর্ষণ মামলায় হেরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ধর্ষিতা হয়ে উঠবে 'ধোঁকাবাজ' নারী, এমনকি 'বেশ্যারও বেশ্যাতর নারী'। পুরো প্রক্রিয়াটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, ধর্ষণের সার্ভাইভার নারী হিসেবে কেউ যখন পুরুষকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত করছেন আর মামলায় জয়ী হচ্ছেন, তখন তিনি ধর্ষিতা হিসেবে প্রমাণিত, এটা যেমন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) সামাজিক কোনো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, তেমনি কেউ যদি ধর্ষিতা

নারী হিসেবে মামলায় হেরে যান তাহলেও নারী হিসেবে তিনি নেতিবাচক সামাজিক ধ্যানধারণার সামনে পড়তে বাধ্য। অন্যপক্ষে, ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত 'ধর্ষক' যদি জিতে যান, তার মানে দাঁড়ায় তিনি প্রমাণিতভাবে 'ধর্ষক' নন, একজন 'অধর্ষক' সম্মানিত পুরুষ (যদিও ধর্ষক মানেই অসম্মানের, সামাজিক বাস্তবতা মোটেও এমন সহজ নয়)— এই হিসেবে সামাজিক সমূহ ইতিবাচকতাসমেত সে অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়া পুরুষ তার সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পান (যদিও ধর্ষণ প্রমাণের পরেও সামাজিক মর্যাদা নানাভাবে অটুট থাকতে পারে, এমনকি ধর্ষণের মামলা থাকলেও একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন, যেমন জাহাঙ্গীরনগরের কাফির যৌন হয়রানির ঘটনা)। আমি আমার গবেষণায় দেখেছি, অভিযুক্ত ধর্ষক 'ধর্ষক' নন, এটা প্রমাণের আকাঙ্ক্ষায় মামলার শেষ পর্যন্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ধর্ষকের পরিবারের সদস্যরা ধর্ষকের সাথে পারিবারিক সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে যৌথভাবে কাজ করে যান, ধর্ষকের পক্ষে সমর্থন দিয়ে যান সালিশ এবং বহুবিধ রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে। সর্বোপরি, ধর্ষণ মামলার বাস্তবতায় ধর্ষকপক্ষীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করবার জন্য ধর্ষকপক্ষ মরিয়াভাবে কাজ করতে থাকেন। আর এই মরিয়া লড়াইয়ে অভিযুক্ত ধর্ষকপক্ষের জন্য সবচাইতে সহজ ও কার্যকর পন্থা হলো আদালতকক্ষে অভিযোগ আনয়নকারী নারীর 'চরিত্রের' ঝান্ডা উড়িয়ে দেয়া আর এই ঝান্ডা ওড়ানোর প্রক্রিয়ায় নানান পন্থায় ধর্ষণের মেডিক্যাল সনদও প্রবল প্রতাপে কাজ করতে থাকে। আর তাই গবেষক হিসেবে আমি নিম্ন আদালতে ধর্ষকের পক্ষে একাধিক পরিবারের সদস্যকে বসে থাকতে দেখেছি, কিন্তু ধর্ষিতা নারীকে দেখেছি আশ্রয়কেন্দ্রে একলা থাকতে। তাকে নারী সংগঠনের কর্মী ও উকিলদের সাথে একলা আদালতকক্ষে লড়তে দেখেছি। এ বাস্তবতা আমাদের সমাজে ধর্ষণের নেতিবাচক বাস্তবতার একটি বড়ো প্রমাণ, মামলা করবার মধ্যে দিয়ে 'অশুচি ধর্ষিতা নারী' হয়ে ওঠা আর সে হিসেবে সার্ভাইভার সেসব নারীকে সমাজের বাইরে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার, অন্য করে তোলার এর চাইতে জোরালো বাস্তবতা বোধকরি আর নেই (শুভ্রা ২০০৮)।

ধর্ষিতার এই সামাজিক নেতিবাচক ধারণা আর অভিযুক্ত ধর্ষকপক্ষের আপেক্ষিকতর 'উচ্চ সামাজিক অবস্থানের' কারণে দেখা যায়, ধর্ষণ মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি নারীবিদ্বেষী, ভিকটিমবিদ্বেষী পরিপ্রেক্ষিত তৈরি থাকে। অন্যান্য ফৌজদারি মামলা বা ক্রিমিন্যাল মামলার ক্ষেত্রে যেরকম প্রমাণাদি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের একটি প্রবণতা বা সামাজিক আগ্রহ বা সামাজিক অনুকূল পরিবেশ একজন অভিযোগকারী নিজে অনুভব করেন বা করবার প্রবণতা থাকে, তার আশপাশের মানুষের সংগ্রহ করবার তাগিদ তৈরি হওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, ঠিক তার বিপরীত অবস্থা তৈরি হয় যখন কিনা একজন ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন (শুভ্রা ২০০৯)। এ কারণে দেখা যায়, ফাইলকৃত ধর্ষণ মামলাগুলোর সাথে কোর্টে মেডিক্যাল প্রমাণের সনদ প্রদান করা হলেও সনদগুলোর মধ্যে গড়ে প্রায় ৮৫ ভাগেই ধর্ষণের সুস্পষ্ট কোনো মেডিক্যাল প্রমাণ থাকে না (ব্লাস্ট ২০১০, রোজারিও ২০১১)। এই প্রমাণ না-থাকা বা হারিয়ে যাওয়ার কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে বিলম্বিত মেডিক্যাল পরীক্ষা। বিলম্বিত মেডিক্যাল পরীক্ষার কারণগুলোর একাংশ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, যেমন থানা হাসপাতালের দূরত্ব, যথার্থ চিকিৎসা সেবা না-পাওয়া, থানা হাসপাতালের চিকিৎসকের অপ্রতুলতা, সালিশের জন্য অপেক্ষা, ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য অংশে আছে সামাজিক মতাদর্শপ্রসূত বিবিধ শুচিতার ভাবনা, যেগুলো মেডিক্যাল প্রমাণাদি হারিয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা তৈরিকারী আচরণ উৎপাদন করে যেতে থাকে এবং ধর্ষিতা ভিকটিম হিসেবে মেডিক্যাল প্রমাণ সংরক্ষণ না-করবার জন্য সামাজিক এজেন্ট হিসেবে নিজে এবং তার পারিপার্শ্বিকতাসমেত কাজ করতে থাকে বা কাজ করতে বাধ্য হয় (শুভ্রা ২০০৯, নারীপক্ষ ২০১০, রোজারিও ২০১১)। সামাজিক শুচিতা আর ধর্ষণসংক্রান্ত নেতিবাচক সামাজিক ধ্যানধারণা উভয়ই বিবিধ পন্থায় মেডিক্যাল সনদের ফরমেটের মধ্যেও বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায় এবং ধর্ষণের মেডিক্যাল প্রমাণাদি সংরক্ষণের প্রক্রিয়া তার প্রকৃতিতে ভীষণরকম পুরুষালি ধ্যানধারণা হাজির করতে থাকে, উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করতে থাকে।

সকল হাসপাতালে ধর্ষণ মামলায় ব্যবহৃত মেডিক্যাল সনদের ফরমেট একইরকম না-হলেও বাংলাদেশের সকল হাসপাতালে পূর্বে উল্লিখিত ফরমেই প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হয়। আপনি যদি এই ফরমেটের দিকে মনোযোগসমেত তাকান, দেখবেন এটি পূরণ করতে ভিকটিম সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়; যেমন মেডিক্যাল সনদে চিকিৎসককে স্তনের গঠন ও প্রকৃতি, স্তানাগ্র, স্তানাগ্র পাদদেশ, যৌনকেশের বিবরণ এবং যৌনাঙ্গের সবিশেষ বিবরণ, ইত্যাদি বিষয়াবলি পরীক্ষাপূর্বক উল্লেখ করতে হয়। নারীর যৌনসম্পর্কে সম্মতি ছিল কি ছিল না সেটা বোঝার সাথে স্তনের আকার, গঠন, যৌনকেশের গড়ন, তলপেটের বেড়, যোনিছিদ্র, যোনিবেড়ের হিসাবনিকাশের কোনো সম্পর্ক থাকবার কথা নয় বা আদতে এই তথ্যগুলো ধর্ষণের সময় ধর্ষিত নারীটি সম্মত ছিল কি ছিল না সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসবার ক্ষেত্রে কোনো যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। স্পষ্টতই এই তথ্যগুলো প্রমাণ করতে পারে না যে ধর্ষিতা ধর্ষণের শিকার হয়েছিল কি হয় নি। তার মানে আদালতের বিচারকার্যে ধর্ষণ প্রমাণ বা প্রমাণ না-করবার উভয় ক্ষেত্রেই এই তথ্যগুলোর কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে না বা থাকবার কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গবেষণায় দেখা গেছে এই তথ্যগুলো মামলা চলাকালে কেবল ধর্ষিতার অতীত যৌন নির্যাতনের কথাই বলে না বরং ধর্ষিতা নারীর 'অতীত যৌন ইতিহাসের' বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাজির করবার পথ তৈরি করে। আর এই অতীত যৌন ইতিহাসই আদালতকক্ষে ধর্ষিতার 'চরিত্রের' চারিত্রিক সনদ প্রদান করবার ভীষণরকম পুরুষালি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করে।

আমাদের সমাজে ধর্ষণকেন্দ্রিক ধারণায় 'সত্যিকারের ধর্ষণ'— এই মিথ খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে বলবৎ থাকে। এই মিথে ধরে নেয়া হয়, 'সত্যিকারের ধর্ষণ মানে অস্ত্রের মুখে, অপরিচিত মানুষ, রাতের অন্ধকারে "আ-চোদা" নারীকে ধরে নিয়ে যাবে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষিতা নারীটির লাশ পাওয়া যাবে এবং মেয়েটি অতি অবশ্যই "কুমারী" থাকবে' (শুভ্রা ২০০৮)। এই শর্তগুলো প্রযোজ্য থাকলেই 'ধর্ষণের সার্ভাইভার' নারী হিসেবে আপনি আদালত থেকে সুষ্ঠু বা যথাযথ বিচার পাবেন, এই ভরসা আপনাকে স্বয়ং আইনও দিতে পারবে না। কিন্তু এই শর্তগুলো কোনোভাবে না-থাকলেই আদালতকক্ষে বিচার কাজে আপনাকে ধর্ষিতা নারী হিসেবে ভীষণরকমভাবে নেতিবাচক-প্রতিকূল পরিস্থিতির বাস্তবতা সামাল দিতে হবে। আমার গবেষণায় একাধিক নারী অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যখন মেডিক্যাল সনদে অভিযোগকারী নারীর স্তন্য "'ঝুলে পড়া' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন"[৩] হচ্ছে তখন আদালতকক্ষে এই তথ্য 'নারীটির স্তন্যে একাধিক পুরুষের হাত পড়েছে' এই অর্থ তৈরি করে, কিংবা একাধিক পুরুষ না-হোক একাধিক 'যৌনসঙ্গমের ঘটনা' অন্তত ঘটেছে সে অর্থ দাঁড় করায়। যেহেতু নারীটির স্তন্য কাঙ্ক্ষিত কুমারী নারীর মতো 'শক্ত ও স্থিতিস্থাপক' নয়, তার অর্থ আরেকটু এগিয়ে দাঁড়ায় যে নারীটি 'হেবিচুয়েটেড টু সেক্স'। আর যে নারী আমাদের সমাজে যৌনজীবনে অভ্যস্ত, তিনি কোনোভাবেই 'সমাজকাঙ্ক্ষিত ভালো মেয়ে নন'। তিনি ভালো নন, তিনি বরং 'বেশ্যা', আর এই বেশ্যা নারীর কোনো যৌনসম্পর্কেই সম্মতি-অসম্মতি প্রকাশের জায়গা নেই। 'বেশ্যার ধর্ষণ হয় না'— এই প্রবল সামাজিক মতাদর্শের তোড়ে পুরুষালি মতাদর্শের বিচারকার্যে এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমাপ্তি টানবারও রেওয়াজ আছে যে, 'এই মন্দ চরিত্রের নারী'র আদতে যৌনকাজে অসম্মতি থাকবার কোনো ঘটনাই/বাস্তবতাই থাকতে নেই, সে আসলে সম্মতই ছিল এবং ফলে মামলা ডিসমিস হয়ে যায়।

এই ফরমেটে রেডিওলজি পরীক্ষার জন্য জায়গা রয়েছে। একজন চিকিৎসক এই পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্ষণের শিকার নারীর বয়সের সীমানা নির্ধারণ করে থাকেন। কিন্তু ব্লাস্টের সংগৃহীত নমুনায় দেখা যায়,

---

[৩] নারীর স্তনে একাধিক পুরুষের হাত পড়ায় কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-শারীরিক 'সমস্যা ও সংকট' আছে বলে যদিও আমি মনে করি না, আর একাধিক পুরুষের হাত পড়া স্তন্যের নারীর ধর্ষণ হয় না এটাও আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমি বরং 'একাধিক পুরুষের হাত পড়া স্তন্যের নারীর সামাজিক অর্থ' কী দাঁড়ায়, সে নিয়ে কথা বলতে বসেছি।

শতকরা ৮৫ শতাংশ মেডিক্যাল সনদে ডাক্তার নিজে ভিকটিমের বয়স সুনির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। চিকিৎসক বয়সের সীমানা ৮ থেকে ১১ বছর এরকম কোনো সিদ্ধান্ত না-দিয়ে স্পষ্ট করে লিখছেন বয়স ১৩ বছর। আর এই নির্ধারণে ভিকটিমের শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলি, যেমন তার স্তন, তার যৌনকেশ, ইত্যাদি বাহ্যিক নির্ধারক হিসেবে কাজ করতে থাকে; যেমন, কোর্টের পরিসরে স্তনের আকার যদি 'ঝুলে পড়া' থাকে, তবে সেটি যৌনতায় অভ্যস্ততা ও অধিক বয়সের ঘোষণা দেয়। ধর্ষণের পুরুষালি বাস্তবতায় দেখা যায়, প্রায় ২০ শতাংশ মেডিক্যাল সনদে নারীর সম্মতি-অসম্মতির আইনি জটিলতা এড়াতে ধর্ষিতা নারীর বয়স ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেয়া হয়। এই ঘটনার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, ব্লাস্টের সংগৃহীত মেডিক্যাল সনদের প্রায় ৮০ শতাংশের ক্ষেত্রে ভিকটিমের উল্লিখিত বয়স আর পরীক্ষক চিকিৎসকের উল্লিখিত বয়সের পার্থক্য গড়ে ৩-৫ বছর। এমনকি গাজীপুরের একজন ৭ বছরের ধর্ষিতা মেয়েশিশুর বয়স মেডিক্যাল সনদে ১৫ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। এমনই একটি ঘটনা ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ধর্ষণের অভিযোগ আনয়নকারী শিক্ষার্থী নারীটির মেডিক্যাল এভিডেন্সেও দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে জন্মসনদ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থী নারীর বয়স ১৫ থেকে বাড়িয়ে ১৬ বছর হিসেবে মেডিক্যাল সনদে দেখানো হয়েছে। বয়স বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনি কাঠামোর ৩৭৫ ধারা আর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অনূর্ধ্ব ১৪ এবং অনূর্ধ্ব ১৬-এর সম্মতি-অসম্মতির ঊর্ধ্বে থাকাটাকে খারিজ করে ভিকটিম নারীর অসম্মতিকে কোর্টের পরিসরে বিতর্কিত চেহারা দেয়াটাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ভিকটিম হিসেবে আপনার বয়স যদি ১৪-এর কম হয় [পেনাল কোড অনুযায়ী] কিংবা ১৬ বছরের কম হয় [নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী] তাহলে ধর্ষণের সার্ভাইভার নারী হিসেবে আপনার জন্য যৌনসঙ্গমে সম্মত ছিলেন কি ছিলেন না সেটা প্রমাণেরই প্রয়োজন নেই। ১৪ বছরের নিচে এবং ১৬ বছরের নিচের নারীর সাথে সম্মতি-অসম্মতির ঊর্ধ্বে যৌনসঙ্গম মাত্রই ধর্ষণ— আইনের এই ক্লজটাকে এড়ানোর জন্য মেডিক্যাল সনদে চিকিৎসকরা বয়স বাড়িয়ে দেন। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনও ভিকটিম নারীর বয়স বাড়িয়ে দেয়ার কাজ করতে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে, এক সার্ভাইভার নারীর বয়স ১৪ বছর হওয়ায় স্থানীয় পুলিশ ধর্ষিতা নারীকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করতে না-দিয়ে পুরানো পেনাল কোডের ধারায় মামলা দায়ের করতে বাধ্য করেন, যাতে মামলায় অভিযুক্ত পক্ষ ভিকটিমের ১৪ বছর পূর্ণ হওয়ার কারণে পুরানো ধারা মোতাবেক সম্মতি-অসম্মতি প্রমাণের একটা সুযোগ পায়।

এর পাশাপাশি এই আদর্শ ফরমেটের ক্ষেত্রে বেশ কিছু তথ্যবিভ্রাট বা তথ্য জটিলতা দেখতে পাওয়া যায়; যেমন ধরা যাক, এই ফরমেটে একজন চিকিৎসক কেবল যৌনসঙ্গম/যোনিতে শিশ্ন প্রবেশ করেছে কি না বা পেনিট্রেশন হয়েছে কি হয় নি তার কথা বলতে পারেন। অপরাপর কোনো প্রক্রিয়া, যেমন যৌন হয়রানি, কনডমসমেত ধর্ষণ, পায়ুধর্ষণ, ধর্ষণের প্রয়াস করা, মুখকাম, ছেলেশিশু ধর্ষণ, ইত্যাদি নানাবিধ প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য প্রদানের কোনোরকম জায়গা এই ফরমেটে চিকিৎসকের জন্য রাখা হয় নি। এমনকি বেশিরভাগ মেডিক্যাল সনদে ভিকটিম নারীর মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের কোনো জায়গা নেই। যদি থেকেও থাকে, সেখানে দেখা গেছে চিকিৎসক লিখেছেন "মানসিক অবস্থা : 'ভালো', অথবা 'চুপচাপ' এবং 'শান্ত'" (ব্লাস্ট ২০১২)। এই ভীষণরকম 'আগ্রাসী', মূলত পুরুষালি 'পেনিট্রেশন'কেন্দ্রিক ধর্ষণের বোধ, আদর্শ নারীশরীরের শুচিতার বোধ এবং কে আসলে সম্ভাব্য ধর্ষণের ভিকটিম নারী হতে পারে— এসব প্রসঙ্গে বিরাজমান সামাজিক ধ্যানধারণাগুলো বিশেষভাবে মেডিক্যাল সনদের একটি পরীক্ষা, যাকে 'ফিঙ্গার টেস্ট' বা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' বলা হয়, তার মধ্যে 'বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার মোড়কে' প্রবলভাবে হাজির থাকে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করবার তাগিদ অনুভব করছি।

টু ফিঙ্গার টেস্ট : হাইমেন হাতড়ে সতীত্বের ঘোষণা

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারটি (OCC-DMCH) বাংলাদেশের সবচাইতে বৃহৎ নারীবান্ধব ওসিসি। ওসিসি-ডিএমসিএইচ-এও ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষার একটি

'স্বাভাবিক' অংশ হিসেবে 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' সম্পাদন করা হয়। আমাদের দেশে এই বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণা কাজ এখনো পর্যন্ত হয় নি, তবে হিউমান রাইটস ওয়াচ (২০১০)-এর মতে 'টু ফিঙ্গার টেস্টে চিকিৎসক তার এক বা একাধিক হাতের আঙুল ধর্ষণের সার্ভাইভার নারীর যোনিদেশে প্রবেশ করিয়ে সতীচ্ছদের উপস্থিতি পরীক্ষা করেন, যোনির ঘনত্ব ও বেড় পরীক্ষা করেন'[৪]। এই টু ফিঙ্গার টেস্ট দিয়ে চিকিৎসক নির্ধারণ করে থাকেন 'মেয়েশিশু' ও নারীটি 'কুমারী' কি না কিংবা যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত কি না। মেডিক্যাল পরীক্ষায় যখন উল্লেখ করা হয় পরীক্ষিত নারীটি যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত, আদালতকক্ষে এর মানেটা দাঁড়ায় ধর্ষণের সময় অভিযোগকারী 'কুমারী' ছিল না। যেহেতু কুমারী নয়, সে কারণে ভিকটিমের প্রতি এক ধরনের সামষ্টিক/পাবলিক সন্দেহ তৈরি হয় এবং এই পাবলিক সন্দেহ নারীটির আনীত অভিযোগের পাল্লাকে হালকা করে দিতে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

টু ফিঙ্গার টেস্ট একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, এর কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্যমান থাকবার কথা নয়। বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ পরিমাপক বলতে যা বোঝায় তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যক্তিভিন্নতায় সে পরিমাপকের পরিমাপ করবার কৌশলে কোনো হেরফের হবে না। ধরা যাক, কেউ একজন জ্বরে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির জ্বর থার্মোমিটার দিয়ে মাপছেন, তিনি যদি থার্মোমিটার ব্যবহারের নীতিমালা জেনে থাকেন, তবে সকল মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার একই হবে; কারণ থার্মোমিটারে ব্যবহৃত পারদ তিনি ব্যক্তিবিশেষে কম-বেশি ব্যবহার করতে পারবেন না। ফারেনহাইট বা সেলসিয়াস স্কেলের বিষয়াদিও তিনি নিজ হাতে বদলাতে পারবেন না। ব্যক্তির জ্বরের পরিমাপ তার নিজস্ব শরীরের তাপমাত্রার সাপেক্ষে বদলে যাবে, আর সেটা থার্মোমিটার-নিরপেক্ষ।

ঠিক তার বিপরীতে, টু ফিঙ্গার টেস্টে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পরিমাপকই ভীষণরকম ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কোনোভাবেই একজন ১৮০ পাউন্ড ওজনের পুরুষের আঙুলের মাপ আর ১১০ পাউন্ড ওজনের নারী চিকিৎসকের আঙুলের বেড় এক হবে না। এমনও না যে, আমাদের দেশে যে সকল চিকিৎসক টু ফিঙ্গার টেস্ট করতে যাচ্ছেন বা করবেন তাঁদের সকলের হাতের আঙুলগুলো কোনো একটা বিশেষ ছাঁচে ফেলে একইরকম বেড়ের করে দেয়া হয়েছে। ফলে থার্মোমিটারের সাথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে কোনোরকমেই কেউ টু ফিঙ্গার টেস্টকে তুলনা করতে পারবেন না। উপরন্তু, কোনো ভিকটিম নারীর যোনিদেশে প্রবেশিত চিকিৎসকের আঙুল শক্ত ঠেকল নাকি সহজে ঢুকে গেল, এ সবই একেবারে ব্যক্তিনিষ্ঠ বা সাবজেকটিভ মূল্যায়নের বিষয়। একজন চিকিৎসকের কাছে যে যোনিবেড় 'অতি ঢিলা' মনে হচ্ছে, আরেক চিকিৎসকের কাছে সেটা 'শক্তপোক্ত'/'টাইট' মনে হতে পারে। এসবের প্রেক্ষিতে সারা দুনিয়ার অসংখ্য চিকিৎসক এই টু ফিঙ্গার টেস্টের যে কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই এ কথা বলে যাচ্ছেন; এবং চিকিৎসকরা এটাও বলছেন, হাইমেন আছে কি নেই তার সাথে নারীটির যৌনসম্পর্কে সম্মতি ছিল কি ছিল না সে প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে আসবার কোনো জায়গা নেই (এইচআরডব্লিউ ২০১০)। উপরন্তু, নারীশরীরের বিভিন্ন গড়ন এবং প্রকৃতি রয়েছে, হাইমেনও নানা কারণে ছিঁড়ে যেতে পারে, ফলে হাতের আঙুল প্রবেশের সাপেক্ষে নারীর অতীত যৌন ইতিহাস হাতড়ে বের করে আনার প্রক্রিয়াটি স্বয়ং পুরুষালি বিজ্ঞানের প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক মূল্যমানহীনতার সাথে সাথে টু ফিঙ্গার টেস্ট আইনি পন্থাতেও আসলে ধর্ষণ প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। বরং কোন বয়সের কোন প্রেক্ষিতের ভিকটিমের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা করা যাবে, সে নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই বলে এই ফিঙ্গার টেস্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বয়ং একটি যন্ত্রণাদায়ক, এমনকি কোনো কোনো ভিকটিম নারীর জন্য পুনর্ধর্ষণের অভিজ্ঞতা হিসেবে হাজির হয়। ব্লাস্টের তথ্য এবং আমার গবেষণায় দেখা গেছে, এই পরীক্ষা ৫ বছর থেকে শুরু করে যেকোনো

[৪] "Dignity on Trial: India's Need for Sound Standards for Conducting and Interpreting Forensic Examinations of Rape Survivors." Human Rights Watch, 2010: pages 37-40.

বয়সের ভিকটিমের ক্ষেত্রেই সম্পাদন করা হয় (শুভ্রা ২০০৮, ব্লাস্ট ২০১০, আসমিতা ২০১১)। এমনও হয়েছে যে, ৬ বছর বয়সী এক মেয়েশিশুর মেডিক্যাল পরীক্ষার পুরোটা সময় সে চিৎকার করে কান্না করে গেছে এবং তার টু ফিঙ্গার টেস্ট পরীক্ষণের পর ফলাফল আসে 'হেবিচুয়েটেট টু সেক্স' (শুভ্রা ২০০৮)। ফলে ভিকটিম হিসেবে কাউকে আদ্যোপান্ত না-জানিয়ে বা কারো অজ্ঞাতসারে সম্মতি নিয়ে যদি এই পরীক্ষা সম্পাদন করা হয়, তবে টু ফিঙ্গার টেস্ট পরীক্ষা সম্পাদন স্বয়ং ধর্ষণ এবং কেবল এই পরীক্ষার কারণে অনেক সার্ভাইভার নারী ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন (রোজারিও ২০১১, শুভ্রা ও আসমিতা ২০১২)।

টু ফিঙ্গার টেস্টের সাথে সমাজে প্রচলিত 'সত্যিকারের ধর্ষণ'— এই ধারণার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ আছে। যদিও কেউ একজন বিশেষ 'ধর্ষণের' ঘটনায় অসম্মত ছিলেন কি না সেটা প্রমাণের সাথে তিনি পূর্বে আর কার সাথে কতবার কী-কীভাবে যৌনসঙ্গমে গেছেন সেটা বিবেচ্য থাকবার কথা নয় এবং সে সূত্রে অভিযোগ আনয়নকারী নারীর হাইমেন পুরানো ছেঁড়া নাকি নতুন ছেঁড়া এসবও বিবেচ্য হবার কথা নয়[৫]। তারপরেও আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণায় কুমারী নারীর ধর্ষণ হয়। বিয়ের সম্পর্কে ধর্ষণ, চেনা মানুষ কর্তৃক ধর্ষণ, প্রেমের সম্পর্কে ধর্ষণ, একলা বেরোলে ধর্ষণ, দিনের বেলায় ধর্ষণ, অশালীন পোশাকের নারীর ধর্ষণ, ঘরের ভেতরে ধর্ষণ, পুলিশ কাস্টডিতে ধর্ষণ, ইত্যাদি বিভিন্ন পদের ধর্ষণ আদতে ধর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ষণের সত্যিকার মর্যাদা পায় না। ক্রমাগতভাবে এই সত্যিকারের ধর্ষণ যেগুলো নয় (এবং যে সমস্ত ধর্ষণ বৈশিষ্ট্যবিচারে সত্যিকারের ধর্ষণ, উভয় ক্ষেত্রে) তাতে সমাজ ও পুরুষালি সামাজিক এজেন্ট ধর্ষণের পেছনের কারণ কেন খুঁজতে শুরু করে? আর এই কারণ খোঁজার প্রক্রিয়ায় যখনই যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ততা মেডিক্যাল প্রমাণে প্রামাণিকভাবে চলে আসে, তখন অভিযোগকারী নারী তার পরিবারসমেত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাবলিক অসম্মানের ধাক্কা সামলাতে না-পেরে বিচারালয়ের বাইরে মামলা নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হয়ে পড়েন। এমনও হয়, উন্মুক্ত আদালতকক্ষে ধর্ষিতা নারীর জবানবন্দি নেয়ার সময় বিবাদীপক্ষীয় উকিলের নানা প্রশ্নের পাশাপাশি ভিকটিমের কথার মাঝখানে আদালতের কামরাভর্তি মানুষ হো হো করে হেসে ওঠেন, নানারকম মন্তব্য করেন, নানাভঙ্গিতে টিজ করেন। এ প্রসঙ্গে আমার গবেষণার এক সার্ভাইভার নারী বলছিলেন, যতবার তিনি স্পষ্ট করে ধর্ষণের কথা না-বলে বলছিলেন 'খারাপ করছে, খারাপ কাজ করছে আমার সাথে', ততবার দর্শক সারিতে বসে থাকা ধর্ষকপক্ষীয় মানুষজন কামরার ভেতর থেকে বলে উঠেছেন, 'কী খারাপ করছে! সখী বলো কী খারাপ করছে' (শুভ্রা ২০০৮)। ভিকির শিক্ষার্থী মেয়েটির মামলার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, অভিযুক্ত ধর্ষক তার পক্ষে ১১ জন উকিল দাঁড় করিয়ে আদালতকক্ষে একটা বিস্তর কেওয়াজের চেষ্টা করতে চেয়েছেন, হট্টগোলের মধ্যে বিচারক কী বলছেন সেটা কারো কানে আসছে না, এরকম পরিবেশমাত্র ধর্ষণের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভিকটিমের জন্য একটা বড়োসড়ো নাজুক সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করে। আর এই নারীবিদ্বেষী, ভিকটিম-অবান্ধব আদালত-পরিবেশ রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে, বিশেষত সকল নিম্ন আদালতে অভাবনীয়ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকৃত ৫ জন বিচারক বলেছেন যে, তাঁরা কোর্টের কার্যক্রমে হাইমেনের অনুপস্থিতি ও নারীর 'নষ্ট' চরিত্রের যুক্তি বহুবার শুনেছেন। তিনজন সার্ভাইভার নারী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাদের মামলা চলাকালে 'দুশ্চরিত্র' প্রমাণের এই চেষ্টা নারীবিদ্বেষী একটি পরিস্থিতি তৈরি করে। এমনকি নারী

[৫] হাইমেন/সতীচ্ছদ যেহেতু একটি ফ্লেক্সিবল পর্দাবিশেষ, তাই সেটা বিবিধ কারণে ছিঁড়তে পারে— শারীরিক কসরতের কারণে হতে পারে, কোনো দুর্ঘটনায় ছিঁড়তে পারে। আবার শত সঙ্গমে গেলেও সতীচ্ছদ না-ও ছিঁড়তে পারে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ছেঁড়া হাইমেন বা সতীচ্ছদ আছে মানেই কেউ কুমারী নয় বা সে যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট সমাপ্তিতে পৌঁছানো আদতে যথার্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে সম্ভব নয়। যে যুক্তিতে সতীচ্ছদ ছেঁড়ার মানেই যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ততা বোঝায়, সেটা আসলে পুরোদুস্তর পুরুষালি জ্ঞানের ফলাফল।

অধিকার নিয়ে কাজ করছেন এমন সংগঠনের কর্মীরাও এই মর্মে জানান যে, "'ভিকটিমের চরিত্র কলুষিত' করতে পারাটা মামলার ক্ষেত্রে ধর্ষকের পক্ষে কাজ করে থাকে" (রোজারিও ২০১১, আসমিতা ২০১২)। ব্লাস্টের অধীনে রেকর্ডকৃত এক মামলার উল্লেখ এখানে জরুরি মনে করছি।

চরভদ্রাসনের ১৩ বছর বয়সের ফাতিমা (ছদ্মনাম) অপহৃত হয় এবং গণধর্ষণের শিকার হয়ে অপহরণের ১ মাস পর তার বাড়ির কাছের পাটক্ষেত থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার হয়। ভিকটিমের পিতা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ (৩) ধারা মোতাবেক অপহরণ ও গণধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। ঘটনার ৪০ দিন পর মেডিক্যাল সনদে চিকিৎসক কিছু তথ্য হাজির করেন যার মধ্যে আছে নারীটির স্তন্য পুরোদস্তুর উন্নীত ও ঝুলে পড়া, যৌনকেশ বাড়ন্ত, হাইমেন পুরানো ছেঁড়া। সনদ এই মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, ভিকটিমের বয়স ১৬ থেকে ১৭, তার শরীরে কোনো জোরপূর্বক যৌনসঙ্গমের চিহ্ন নেই কিন্তু নারীটি যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত। এই সনদের হাত ধরে পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত ৭ আসামির মধ্যে ৫ আসামি বেকসুর খালাস পেয়ে যায়, চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে তাদের নাম ওঠে নি। বাকি দুই আসামির একজনের সাথে নারীটির পূর্বপরিচয় থাকবার কারণে আদালত পুনর্বার তদন্তের নির্দেশ দেন। নির্দেশে আদালত তদন্ত কর্মকর্তাকে তিনটি সূত্রে তদন্ত চালানোর নির্দেশ জারি করেন : ১. প্রত্যক্ষ, নিরপেক্ষ ও স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে, ২. ভিকটিমের ভালোবাসার সূত্রগুলি ভালোভাবে দেখিতে হইবে এবং ৩. তদন্তপূর্বক আসামিকে গ্রেফতার করিতে হইবে। এই তদন্তের প্রেক্ষিতে মেডিক্যাল সনদের যৌনসম্পর্কে অভ্যস্ততা এবং জোরপূর্বক যৌনসঙ্গমের কোনো লক্ষণ না-থাকার প্রমাণ ও অভিযুক্ত এক ধর্ষকের সাথে বাদীর ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারার মধ্য দিয়ে কোর্ট গণধর্ষণের মামলা খারিজ করে দেন এবং চার্জশিটে ওঠা দুই অভিযুক্ত আসামিও অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা থেকে খালাস পেয়ে যায়।

মনে রাখা জরুরি যে, ধর্ষণ মামলার বিচারিক কার্যক্রমে ধর্ষিতা নারীর অতীত যৌন ইতিহাস নিয়ে কথা বলা ধর্ষকপক্ষের 'আত্মপক্ষ' সমর্থনমূলক যুক্তি হিসেবে কাজ করতে থাকে। ধরেই নেয়া হয়, যে নারী জীবনে একবার যৌনসঙ্গম করে ফেলেছেন, তিনি আসলে ধর্ষিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। মনেই করা হয়, যে নারী যৌনভাবে সক্রিয়, তিনি অতি অবশ্যই 'অনৈতিক', অবৈধ সম্পর্কে থাকেন বা আছেন আর তাই তার যৌনসম্পর্ক মাত্রেই সম্মতি থাকতে বাধ্য। এই পুরুষালি চিন্তার সংস্কৃতি এই বোধ রাখে না বা রাখতে চায় না যে একজন নারী, তার নৈতিকতা যেমনই হোক, তার চরিত্র যত তরল বা কঠিনই হোক, প্রতি যৌনসম্পর্কে প্রতিবার তার সম্মতি দেয়া বা না-দেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এই পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ধর্ষকের কর্মকাণ্ড আর মূল মনোযোগে থাকে না বরং অভিযোগ আনয়নকারী ধর্ষিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি, তার অতীত যৌন ইতিহাস, তার চালচলন, তার সম্পর্ক, তার আচরণ এমনকি তার পোশাকআশাক, বিচরণ, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগের জায়গায় চলে আসে। ফলে আমার গবেষণা অভিজ্ঞতা মতে, ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত বেশিরভাগ 'পুরুষ' কোর্টে এটা প্রমাণ করতে চায় না যে, তারা কোনোরকম যৌনসম্পর্কে যায় নি। কোর্টে কোনো যৌনসঙ্গম হয় নি এটা প্রমাণ করা যতটা কঠিন, তার চাইতে নারীর সম্মতিতে যৌনসম্পর্ক হয়েছে— অভিযুক্তের জন্য এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা অধিকতর সহজ কিংবা এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ধর্ষকপক্ষকে তেমন কোনো বেগ পেতে হয় না। পরীক্ষক যখন মেডিক্যাল পরীক্ষার সনদে অভিযোগ আনয়নকারী নারীর যোনিদেশকে ঢিলেঢালা পান আর হাইমেন পুরানো ছেঁড়া পান, তখনই সেটা অভিযুক্ত ধর্ষকের জন্য নারীর চরিত্রহরণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক সত্যের মোড়কে ধর্ষকপক্ষীয়রা এটা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, অভিযোগ আনয়নকারী নারীটির 'চরিত্র ভালো না', সে 'খারাপ মেয়ে'। যেহেতু নারীটি মন্দ চরিত্রের, তাই যৌনসঙ্গম নারীটির সাথে হয়েছে ঠিক, তবে তাতে অভিযোগ আনয়নকারী নারীর পুরোদস্তুর সম্মতি ছিল।

সুশীল সমাজের আন্দোলন এবং হিউমান রাইটস ওয়াচের তদন্তের প্রেক্ষিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ওই সমস্ত প্রমাণ ব্যবহারকে আইন-বহির্ভূত ঘোষণা করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে ধর্ষিতার যৌনসঙ্গমের অভ্যস্ততা মামলার সময় প্রমাণে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের বিচারালয়ের বাস্তবতা মাথায় রেখে যদি আমরা একটি ভিকটিম ও নারীবান্ধব চিকিৎসা-আইনিব্যবস্থা ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে কায়েম করতে চাই, তবে অতি অবশ্যই আমাদের সেই সব তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি'কে খারিজ করতে হবে, যেগুলো ভিকটিমের অতীত যৌন হয়রানির ইতিহাস নয় বরং অতীত যৌন ইতিহাস প্রমাণের সনদ হিসেবে কাজ করে।

ধর্ষণ একটি আইনি বিষয়, যার সাথে 'পুরুষালি ক্ষমতা প্রয়োগ' ও 'পুরুষালি রাজনীতি'র সম্পর্ক আছে। ধর্ষণ কোনো চিকিৎসাকেন্দ্রিক প্রপঞ্চ নয়, বরং ধর্ষণের সামাজিক অর্থময়তার কারণেই ধর্ষণকে অপ্রমাণিত করা যেমন কঠিন, তেমনি প্রমাণ করা আরো কঠিন। এই বাস্তবতায় আরো মনে রাখা জরুরি, যে সকল প্রতিষ্ঠান ধর্ষণের মেডিক্যাল প্রমাণ সংরক্ষণ ও সংগ্রহের জন্য কাজ করে, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজের ধর্ষণকেন্দ্রিক প্রভাবশালী পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

ধর্ষণের মেডিক্যাল প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সমাজ-প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতা

ধর্ষণের ক্ষেত্রে পুলিশি তদন্তের প্রয়োজনেই মূলত মেডিক্যাল প্রমাণাদি সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। ওসিসি-ডিএমসিএইচ-এর মতে, ধর্ষণ ঘটার সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আলামত পাওয়া যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ধর্ষণের পর যত তাড়াতাড়ি মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হবে, আলামত ভিকটিমের শরীরে তত বেশি থাকবে। বিলম্বিত মেডিক্যাল পরীক্ষা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি অতি সাধারণ ঘটনা। শতকরা ৩০ থেকে ৪৫ ভাগ ভিকটিম ৭২ ঘণ্টা পার হবার পর ওসিসি-ডিএমসিএইচে মেডিক্যাল পরীক্ষা করতে আসেন। এই বিলম্বের একটি কারণ হলো, নারীরা কোনোভাবেই ধর্ষণের সমাজপ্রদত্ত ভয়াবহ 'ট্রমা'র কারণে মামলা করবেন কি করবেন না, এই সিদ্ধান্তে খুব দ্রুত স্পষ্টভাবে পৌঁছাতে পারেন না। অনেক সময় ভিকটিম ও তার পরিবার সালিশের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি প্রণয়নের চেষ্টা করে থাকেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিপতিশীল ধর্ষক পক্ষের চাপে ধর্ষণের অভিযোগ সামনে আসতে পারে না, প্রাণনাশের হুমকিও থাকে। সামাজিক নেতিবাচক পরিস্থিতি, ধর্ষণের 'সম্ভ্রমহীনতা'— এ সকল বাস্তবতার জটিল মিথস্ক্রিয়ায় মামলা করবার সিদ্ধান্তই প্রলম্বিত হয়। এর পাশাপাশি অনেক নারীই ধর্ষণের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল আলামতের প্রয়োজনীয়তা কী, কী-কীভাবে এর সংরক্ষণ করা যায়, এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না। ভিকটিম বাদে তার পরিবার, এমনকি স্থানীয় নেতা বা পুলিশের কারণেও বিলম্বিত মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়ে থাকে। সার্ভাইভার নারীটির পরিবার তার পরিবারের নারীটি যাতে সামাজিক ট্রমার সম্মুখীন না-হোন, সেজন্য ধর্ষণের ঘটনা অনেক সময় চাপা দেয়ার চেষ্টা করে। কোনো কোনো সময় গোপন করতে ভিকটিমকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। কখনো কখনো সালিশের মাধ্যমে, ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে এই ঘটনা স্থানীয় পরিসরেই মিটমাট করতে চায়। এ সমস্ত কারণে দেখা যায়, ভিকটিম নারীটি সেই ৭২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এসে এফআরআই দাঁড় করিয়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাবার মতো কোনোরকম বাস্তব অবস্থানে থাকেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ধর্ষকের সামাজিক অবস্থান রাজনৈতিক-সামাজিকভাবে অভিযোগ আনয়নকারী ধর্ষিতার চাইতে অধিপতিশীল জায়গায় থাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং পুলিশ প্রশাসন নানা কিসিমের অসহযোগিতামূলক কাজ করতে থাকে। এমনকি ঘুষের বিনিময়ে পুলিশ ঠিক সময়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা না-করিয়ে থানায় ভিকটিমকে রেখে দিয়েছে, এমন একাধিক ঘটনা নারীর অভিজ্ঞতায় দেখতে পাওয়া যায় (শুভ্রা ২০০৮)। ব্লাস্টের তথ্য মতে, ৭৫ শতাংশ ধর্ষণের সার্ভাইভার নারীকে স্থানীয় পুলিশ মেডিক্যাল পরীক্ষার নাম করে থানার আশপাশে ঘুরে বেড়াতে বা অপেক্ষা করতে বাধ্য করে। এফআইআর করতে অস্বীকৃতি জানায়, নানারকম

নথিপত্রগত বা প্রশাসনিক ধামকি প্রয়োগের মাধ্যমে মেডিক্যাল পরীক্ষাকে বিলম্বিত করে। এদের পাশাপাশি ধর্ষকপক্ষীয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা নানাভাবে ধর্ষণের ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে কোর্টের বাইরে নিষ্পত্তি করার একটি চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এক্ষেত্রে এমনকি প্রাণনাশের হুমকির ঘটনাও রয়েছে। এসব শেষে যখন নারীটি দেখেন, মামলা করা ছাড়া তার পক্ষে বিচার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই কোথাও নেই, তখন তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে আসেন; আর এর মধ্য দিয়ে সেই ক্রুশিয়াল ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে যায়।

এই অবস্থার একটি উদাহরণ হিসেবে ভিকির ঘটনার বরাত দেওয়া যায়। বহুল আলোচিত ভিকি ধর্ষণের ঘটনা ঘটার ৪৫ দিন পর ভিকটিমের মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। আর এই সময়ের মধ্যে ভিকির ভিকটিমের পরিবার বিভিন্ন পন্থায় স্কুলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সমঝোতা করে ভিকির শিক্ষার্থী ধর্ষণের বিচার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়ার জন্য লড়াই করে গেছে। এ লড়াইয়ের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা এটা ভুলে যাই যে ধর্ষণ একটি আইনি বিষয় এবং আদালত ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেরই ধর্ষককে ধর্ষণের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা নেই। ধর্ষণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্তের কর্মরত প্রতিষ্ঠান অভিযুক্তকে তার পেশা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ধর্ষণের মামলা চলাকালে যেকোনো প্রতিষ্ঠান, বিশেষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অভিযুক্তকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দিতে প্রশাসনিক-প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাধ্য। বিষয়টা আদতে এমন দাঁড়ায় যে, আমরা আমাদের সচেতনতার অভাবে ভুল জায়গায় ভুলভাবে দোষীর শাস্তি আদায়ের চেষ্টা করতে থাকি; আর এর মাধ্যমে আদতে ধর্ষণের মামলা দায়ের করবার ক্ষেত্রে ধর্ষিতার হাতে যে যে প্রমাণ শক্তিশালী হিসেবে থাকতে পারত, সেগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবার কোনো যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারি না এবং সর্বোপরি প্রমাণগুলো আমরা হারিয়ে ফেলি।

ধর্ষণের প্রমাণ হারিয়ে যাবার ক্ষেত্রে নারীশরীরের সামাজিক শুচিতার ধারণা আরেকটি উপাদান হিসেবে কাজ করতে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণঘটনার পর পর ভিকটিম শরীরে পানি ঢালা এবং পরনের কাপড় নষ্ট করে ফেলা বা ভিজিয়ে ধুয়ে ফেলার মতো কাজ করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। ওসিসি ডিএমসিএইচ-এর মতে, তাদের কাছে পরীক্ষা করতে আসা নারীদের প্রায় ৬০ ভাগই গোসল করে মেডিক্যাল পরীক্ষা করতে আসেন (রোজারিও ২০১১)। যেহেতু সামাজিকভাবে ধর্ষণ একটি ট্রমা, একটি বিদীর্ণ মুহূর্ত, এ কারণে নারীটি সে বিদীর্ণ সময় থেকে নিজেকে বিযুক্ত করবার জন্য যে আচরণগুলো করতে থাকেন, তার মধ্য দিয়ে অভিযুক্ত ধর্ষকের ডিএনএ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আলামত ধর্ষিতার শরীর থেকে নাই হয়ে যায় (শুভ্রা ২০০৯)।

কেবল জেলাভিত্তিক সরকারি হাসপাতালগুলোতে ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষা হয় বলে এই চিকিৎসাসেবা আসলে সব ভিকটিমের জন্য সহজলভ্যও নয়। দূরবর্তী মফস্বলে বা গ্রামে থাকা নারী কিংবা যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই শোচনীয় এমন অঞ্চলের নারীরা এ কারণে যথাসময়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে পারেন না। এমনকি ঢাকা শহরে কেবল দুটো হাসপাতালে ধর্ষণের আলামত সংগ্রহ করা হয়। ফলে দেখা যায়, ঢাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আসার কষ্ট ট্রমাটিক অবস্থায় থাকা নারীর জন্য সবসময় ঠিক সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। দূরবর্তী এবং কমসংখ্যক হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষার সুযোগ থাকার পাশাপাশি এই পরীক্ষা করবার যে সময়সূচি সেটাও বিলম্বিত পরীক্ষার একটি কারণ। ওসিসি-ডিএমসিএইচ-এ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২.৩০টা পর্যন্ত শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়। ঢাকার বাইরেও এই সময়সূচিতেই কাজ চলে। ফলে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে কেউ যদি হাসপাতালে ২.৩০টার পরে এসে পৌঁছান, তবে তিনি ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাসেবা পেতে পারেন ঠিক, কিন্তু ফরেনসিক পরীক্ষা করবার জন্য তাকে রাতভর অপেক্ষা করতেই হবে। কিংবা কোনো নারী যদি বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৩০টার পরে ধর্ষণের ভিকটিম হিসেবে পরীক্ষার জন্য এসে পৌঁছান, তবে তাকে ৪০ ঘণ্টা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই ধরনের অপেক্ষা ভিকটিম নারীর

জন্য ভয়াবহ মানসিক টানাপোড়ন ও যন্ত্রণা তৈরি করতে থাকে (শুভ্রা ২০০৮, রোজারিও ২০১১, আসমিতা ২০১২)।

ফরেনসিক বিভাগে চিকিৎসকের স্বল্পতা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। যেহেতু ফরেনসিক বিভাগে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা হাসপাতালের বাইরে বেসরকারি পর্যায়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন না; ফলে এই বিভাগে আসলে আগ্রহ নিয়ে তেমন কোনো চিকিৎসক পড়তেই আসেন না। তাছাড়াও, যেহেতু মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে এক বা একাধিকবার কোর্টে ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষক হিসেবে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয়, সে কারণেও চিকিৎসকরা এই বিভাগে কাজ করতে আগ্রহ বোধ করেন না[৬]। বিভিন্ন সময়ে ফরেনসিক বিভাগের পরীক্ষক চিকিৎসকদের ওপর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের চাপ, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি, ইত্যাদিও বলবৎ থাকে। এর বাইরে বিশেষভাবে নারী চিকিৎসকরা সামাজিক হয়রানি, অনিরাপত্তা, ইত্যাদির কারণে ফরেনসিক বিভাগে পারতপক্ষে কাজ করতে চান না। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এক নারী চিকিৎসক জানাচ্ছিলেন, যেহেতু তিনি ফরেনসিকে কাজ করেন, তাঁর আত্মীস্বজনরা আসলে তাঁকে ঠিক ডাক্তার মনে করেন না, এবং যেহেতু ফরেনসিক বিভাগে কাজ করেন বলে তিনি ধর্ষিত নারীদের পরীক্ষা করেন এবং 'মরা কাটেন', সে কারণে তাঁকে প্রায়ই তাঁর শ্বশুরবাড়িতে কথা শুনতে হয়। নারী চিকিৎসক জানাচ্ছিলেন, 'ধর্ষণের ভিকটিম নারীকে যেমন মানুষ নোংরা ভাবে, তেমনি তার পরীক্ষক নারী ডাক্তারকেও মানুষ খারাপ ভাবতে থাকে, আর সেটা তিনি টের পান'। আরেক নারী চিকিৎসক বলছিলেন যে, ফরেনসিক বিভাগে কাজ করবার তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল, পরিবারের নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি তাঁর ইচ্ছা শেষপর্যন্ত পূরণ করতে পারেন নি। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছিল, 'ভালো কিছু নিয়ে পড়ো, গাইনি টাইনি নিয়ে পড়ো, ফরেনসিক নিয়ো না'।

ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসকদের ওপর যে কেবল স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাবানরাই প্রভাব খাটান এমন নয়, হাসপাতালের কোনো বড়ো কর্মকর্তাও ধর্ষকের পক্ষে কাজ করতে পারেন। আমার গবেষণায় এক চিকিৎসক জানাচ্ছিলেন, একবার তাঁর হাসপাতালের ডিরেক্টর এক ধর্ষককে বাঁচানোর জন্য নেমে আসেন এবং তিনি একই অভিযুক্তের দ্বারা ধর্ষিত একাধিক ভিকটিমকে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে বাধ্য করেন। কেবল পরীক্ষা না-করাতে বাধ্য করা নয়, অনেক সময় ঘুষ বা অর্থের বিনিময়ে কিংবা বিভিন্ন চাপে, পুলিশের মাধ্যমে বা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার চাপের কারণে ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসকরা ভুল মেডিক্যাল রিপোর্ট দিয়ে থাকেন (রোজারিও ২০১১)। নানা অজুহাতে চিকিৎসকরা মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য আগত ভিকটিমকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করাতে থাকেন। যেহেতু চিকিৎসককে পরীক্ষা করলেই এভিডেন্ট অ্যাক্টে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে হবে, এই ভয়ে নানা কারণে তাঁরা পরীক্ষা না-করাবার অজুহাত তৈরি করতে থাকেন। বাকি সকল কাজ গুরুত্বসহকারে করতে থাকেন বা একটা সাদাসিধে রিপোর্ট দিয়ে নিজের চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব শেষ করে দেন। অনেক সময় কোনো চিকিৎসকের মূল লক্ষ্যই থাকে, যতটা সম্ভব কমসংখ্যক ভিকটিমের মেডিক্যাল পরীক্ষা করা। আবার এমন চিকিৎসকও পাওয়া যায়, যিনি অস্বাভাবিকভাবে মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যক ভিকটিম নারীর মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পাদন করে যাচ্ছেন (শুভ্রা ২০০৮, শুভ্রা ও আসমিতা ২০১২)।

ওসিসি-ডিএমসিএইচ-এ নারী চিকিৎসক ও কর্মকর্তা বেশি থাকলেও দেশের অন্যান্য হাসপাতালের ওসিসি এবং ফরেনসিক বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকদের মধ্যে নারী চিকিৎসকের সংখ্যা অসম্ভবরকম কম। যদিও মেডিক্যাল পরীক্ষার সনদের শর্ত মতে, পরীক্ষার সময় একজন নারী সহায়তাকারী/অ্যাটেনডেন্ট থাকাটা বাধ্যতামূলক, তারপরেও এই শর্ত সবসময় বহাল থাকে না বা পালন করা হয় না। নারী চিকিৎসকের তুলনায় পুরুষ চিকিৎসকের সংখ্যা অধিকতর হওয়াতে ধর্ষণের পরীক্ষার মধ্যে যেমন

[৬] Under the *Evidence Act*, once a doctor signs a medical report, he is legally obligated to testify to prove the authenticity of the report.

ভিকটিম নারীর জন্য একটি 'অস্বস্তিদায়ক' পরিস্থিতি তৈরি হয়, তেমনি ১০ জন সার্ভাইভার নারী স্পষ্ট করে বলেছেন, পুরুষ চিকিৎসক ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পাদন করলে তিনি অনেকসময় ভীষণরকম নারীবিদ্বেষী প্রবণতায় সার্ভাইভার নারীকে বিচার করে থাকেন [নারী চিকিৎসকমাত্রই নারীবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গিমুক্ত, এরকম কোনো অতি আবশ্যক সিদ্ধান্ত দেয়া আমার কাজ নয়]। সার্ভাইভার নারীরা জানান, পুরুষ চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নারী পরীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির বিবিধ পার্থক্য রয়েছে। এক সার্ভাইভার বলেন, যদি কোনো নারী বিবাহিত হোন, সে কারণেও যদি তিনি যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তারপরেও পুরুষ চিকিৎসক সহজেই এটা ধরে নেবেন যে ধর্ষণ হয় নাই, মিউচুয়াল সেক্স হয়েছে। তিনি আরো বলছিলেন, 'এমনটা আমাদের অনেকের বেলাতেই হয়েছে। পুরুষ ডাক্তার লিখে দিয়েছে ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায় নি। ...আমি বিবাহিত, পুরুষ চিকিৎসক যখন এই কথা সনদে লিখে দিয়েছিলেন, কোর্টে চিকিৎসকের এই মন্তব্য আমার জন্য খুব ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে যাচ্ছে'।

চিকিৎসকের এই ধারণা যে সামাজিক 'সত্যিকার ধর্ষণের' ধারণা থেকে তৈরি হচ্ছে, আর এতে যে পুরুষালি ধর্ষণ পরিমাপের বিষয়গুলো বারবার উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত হচ্ছে— মেডিকো-আইনি পরিসরের এই বাস্তবতার দিকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দেয়া অতি জরুরি মনে করি।

অথবা তুমি কেবলই দুই আঙুলের ঢিলেঢালা "অসতী নারী"

এই প্রবন্ধের শুরুতে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ধর্ষণের সার্ভাইভার শিক্ষার্থী নিয়ে আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলছিলাম। সে অভিজ্ঞতা থেকেই আবার শেষ অংশের লেখা শুরু করতে চাইছি। 'অভিজ্ঞতায় ধর্ষণ' শীর্ষক গবেষণা কাজটি করবার সময় নিপীড়িত নারীদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘসময় নিয়ে তাদের ধর্ষণের পরে কৃত মেডিক্যাল পরীক্ষার অভিজ্ঞতার কথা 'নিপীড়ন', 'অস্বস্তি' হিসেবে হাজির করেছিলেন। একজন 'বিজ্ঞানমনস্ক সামাজিক গবেষক' হিসেবে বিজ্ঞানের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাসে গবেষণা কাজ করবার সময় আমার মনে হতো, ধর্ষণের ট্রমার কারণে আসলে নিপীড়িত নারীরা মেডিক্যাল পরীক্ষার মতো একটি 'বস্তুনিষ্ঠ' পরীক্ষাকেও ঠিক সহজে গ্রহণ করতে পারছে না। অর্থাৎ তাদের এই অস্বস্তির কারণ মোটাদাগে মেডিক্যাল পরীক্ষা নয় বরং ধর্ষণের ট্রমা, আমি নিজের ভেতর গবেষক হিসেবে এটিই শনাক্ত করে গেছি। ধর্ষণের সময়কার সাক্ষী উপস্থিত করবার চাইতে নিঃসন্দেহে মেডিক্যাল পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়া আমার জন্য বাংলাদেশের নারীবাদী লড়াইয়ের একটি উন্নততর অর্জনও বটে। 'আপনি খুন হলেও তো আপনার পোস্টমর্টেম হবে'— একইভাবে আপনি ধর্ষণের সার্ভাইভার হলে আপনার মেডিক্যাল পরীক্ষা করাটাও জরুরি। মেডিক্যাল পরীক্ষাকে আমি একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূল্যমানের বাইরের কিছু হিসেবে উপলব্ধি করে এসেছি। ধর্ষণকেন্দ্রিক মেডিক্যাল পরীক্ষার মধ্যে নারীর বয়ানে আমি কোনো নিপীড়নের চেহারা 'যৌক্তিক' বলে নিজে ঠিক মেনে নিতে পারতাম না। সিএমএম কোর্টে ভিকির সেই শিক্ষার্থীর ১১ জন উকিলের বক্তব্য গবেষক আমাকে বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার জগৎ থেকে এক ধাক্কায় বাস্তবে নিয়ে আসে। প্রথমবারের মতো আমার মনে পড়ে যায়, গবেষিত পলার (ছদ্মনাম) কথা, যিনি আমাকে বারবারই বলতেন, 'আপনি যেই অপারেশনে যান, শরীরে ডাক্তাররা কোনো না কোনো পোশাক পরায়ে দিবো। আমগো মতো ধর্ষিতাকে পরীক্ষার সময় পুরা নেংটা কইরা দাঁড় করায়। ডাক্তারের সামনে দাই শরীরের নানান অংশ টিপ্পা দেখে। আমার পরীক্ষার সময় পুরুষ ডাক্তারই সব করছে, কোনো মহিলা কইলাম ছিলো না'। এই প্রসঙ্গেই গত ১৬ এপ্রিল ২০১৩ সালে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় 'নারীর জন্য এ কেমন ব্যবস্থা?' শীর্ষক প্রতিবেদন ছাপা হয়। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে কোনো নারী চিকিৎসক, কোনো নারী নার্স এমনকি আয়াও নেই। এই প্রতিবেদন আরো উল্লেখ করে, ঢাকা মেডিক্যালের ফরেনসিক বিভাগে শারীরিক পরীক্ষার জন্য কোনো পৃথক কক্ষ নেই। চিকিৎসকদের বসার কক্ষের সামনের বারান্দায় একটি টেবিল রাখা। পুরুষ চিকিৎসক পুরুষ ওয়ার্ডবয়ের সহযোগিতায় সেই টেবিলের ওপর ধর্ষণের শিকার

নারীকে রেখে তাঁর পরিধেয় কাপড় খুলে শারীরিক পরীক্ষা করেন। সবুজবাগ থানার সহকারী পুলিশ পরিদর্শক বিকাশ কুমার ঘোষ আদালতের নির্দেশে বয়স নির্ধারণের জন্য একটি মেয়েকে ফরেনসিক বিভাগে আনলে খোলা বারান্দার টেবিলের ওপর পুরুষ ওয়ার্ডবয় আগত নারীটির কাপড় খুলতে শুরু করলেই তিনি চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন (সূত্র প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০১৩[৭])। দৈনিক প্রথম আলোতে হাজির হওয়া এই প্রতিবেদনের সাথে আমার গবেষণার বয়ানকৃত নারীদের অভিজ্ঞতায় তেমন কোনো ব্যবধান পাওয়া যায় না। ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষা করার সময় শর্ত হিসেবে আবশ্যিকভাবে যে চিকিৎসক পরীক্ষা করছেন, তিনি নারী হোন বা পুরুষ, তার সাথে অবশ্যই একজন নারী নার্স বা আয়া থাকতে হবে। গবেষণায় ৯ জন ধর্ষণের সার্ভাইভার নারী বলেন যে, তাদের মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় কোনো আয়া বা নারী নার্স ছিল না, বরং পুরুষ চিকিৎসক একলাই মেডিক্যাল পরীক্ষা করিয়েছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়ার্ডবয় উপস্থিত ছিল। কারো কারো বেলায় নার্স না-থাকলেও পরীক্ষা শেষে নার্স তাঁর উপস্থিতিজ্ঞাপক স্বাক্ষর দিয়ে গেছেন। সার্ভাইভার নারীদের সম্মতিও আসলে মেডিক্যাল পরীক্ষা কীভাবে করা হবে সে প্রসঙ্গে কোনো পরিষ্কার কথা না-বলেই লিখিতাকারে গ্রহণ করা হয়। নমুনা হিসেবে ব্লাস্টের অধীনে রেকর্ডকৃত ২৫টি মামলার মেডিক্যাল এভিডেন্সের মধ্যে ১১টি মেডিক্যাল এভিডেন্সের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পরীক্ষক চিকিৎসকের সাথে সহকারী হিসেবে কোনো নারী নার্স বা আয়ার নাম উল্লেখ করা নেই।

বিরাজমান এই নারীবিদ্বেষী মেডিক্যাল পরীক্ষণের ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে ধর্ষণের মেডিক্যাল পরীক্ষার ফরমেট নিজেই একটি পুরুষালি মতাদর্শিক উৎপাদন। ব্যবহৃত টু ফিঙ্গার টেস্ট ধর্ষণের সার্ভাইভার নারীর যোনিপথের ঘনত্ব পরিমাপ করে, তার হাইমেনের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি নির্দিষ্ট করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকৃত চিকিৎসক জানান, পরীক্ষার সময় নারীর হাইমেনকে একটি গোলাকার ঘড়ির ফ্রেম হিসেবে দেখা হয়। ঘড়ির কাঁটার ৩ বা ১০-এর অবস্থানে যদি ধর্ষিতার হাইমেন ছেঁড়া থাকে, তবে চিকিৎসক ধরে নেন এখানে জোরাজুরি বা অসম্মতির সেক্স হয় নি। আর যদি হাইমেন নিচের দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার ৫ অথবা ৮-এর দিকে ছিঁড়ে, তবে চিকিৎসক এটা ঘোষণা করেন যে এই হাইমেন ছেঁড়ায় জোরারোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি টু ফিঙ্গার টেস্টে ব্যবহৃত চিকিৎসকের হাতের আঙুল তাঁর শরীরের আকার, গড়ন, ইত্যাদির ভেদে যেমন বিভিন্ন হয়, তেমনি একজন চিকিৎসক তাঁর আঙুলের বেড়ের সাপেক্ষে নিজস্ব অনুভূতিতে অনুভব করেন যে আঙুল কত সহজে বা কঠিনে যোনিপথে প্রবেশ করল। ফলে এই ভীষণ সাবজেকটিভ পরীক্ষণ পদ্ধতি কখনোই নারীশরীরের ভিন্নতর গঠন বাস্তবতাকে নির্ণয় করবার কোনো ক্ষমতা রাখে না। বরং নারীশরীরের এই মাপজোকের সাথে নারীর যৌনসম্পর্কে অসম্মতি আছে কি নেই তার যতটা না সম্পর্ক রয়েছে, তার চাইতে 'সত্যিকারের ধর্ষণের' ধারণা এই মাপজোকের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতায় প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় আমরা ধরেই নেই, ধর্ষণ হতে পারে রাতের আঁধারে, অস্ত্রের মুখে, অচেনা মানুষ কর্তৃক এবং 'হাইমেন অক্ষত থাকা' সমাজের 'কুমারী' নারীর সাথে, যা কিনা নিচের দিকে, নতুন করে হাইমেন ছিঁড়লে এবং যোনিপথ শক্তপোক্ত হলেই কেবল ঘটতে পারে। ফলে যে নারীর হাইমেন আগে ছিঁড়েছে, সে যে কারণেই হোক, যে নারী বিবাহিত, যার যোনিপথ সমাজ অনুমোদিত 'স্বামীসঙ্গের' কারণেও ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছে, মেডিক্যাল এভিডেন্স তাঁর প্রসঙ্গে 'হাইমেন ওল্ড রেপচার', 'হেবিচুয়েট টু সেক্স' এই বিশেষণগুলো ব্যবহার করবে। আর কোর্টে মেডিক্যাল পরীক্ষার এই ওল্ড রেপচার, হেবিচুয়েট টু সেক্স বিশেষণগুলো নারীর পূর্বেকার যৌন ইতিহাসের বয়ান উপস্থিত করে, বিচারকক্ষে ধরে নেয়া হয় নারীটি পূর্বেও যৌনকাজে লিপ্ত হয়েছে। ফলে তাঁর 'সতীত্ব' নেই, পুরুষালি আইনি পরিসর ধর্ষকের তরফ থেকে নারীর ধর্ষণকেন্দ্রিক অসম্মতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার সুযোগ তৈরি করে দেয় এবং এই সামাজিক ধারণাতেই বিচার প্রক্রিয়া চলতে শুরু করে— 'যে নারী কুমারী না, তার ধর্ষণ হয় কীভাবে?' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই

[৭] উৎস সংবাদের লিংক : http://www.prothom-alo.com/detail/date/2013-04-18/news/345754.

বিশেষণ কোনো বিশেষ বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, টু ফিঙ্গার টেস্ট কোন বয়সের ধর্ষিতা নারীর সাথে সম্পাদন করা যাবে এ নিয়ে কোনো নীতিমালা প্রণীত হয় নি। আর তাই মেডিক্যাল পরীক্ষার সনদে ৮, ৬ এমনকি ৫ বছরের মেয়েশিশুও (টু ফিঙ্গার টেস্টের পরে) 'হাইমেন ওল্ড রেপচার', হেবিচুয়েট টু সেক্স' এই বিশেষণে বিশেষায়িত হতে পারেন। ।

ধর্ষণ মানুষের একটি শারীরিক-মানসিক কর্মকাজের অসম্মতি[৮]। নারীকে এই অসম্মতি প্রকাশের ক্ষমতা ব্যক্তিকভাবে, এমনকি সামষ্টিকভাবে পুরুষালি সমাজ কখনোই অবাধে ধারণ, পোষণ ও প্রকাশ করতে দেয় না। নারীর অসম্মতি তাই সমাজকাঙ্ক্ষিত পন্থায়, সমাজকাঙ্ক্ষিত নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। নারী হিসেবে কারো ধর্ষণ তখনই মেডিক্যাল প্রমাণ করতে ও কোর্টে প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, যখন ধর্ষক তার চেনা না হয়। কেউ একজন তখনই ধর্ষণের শিকার হতে পারেন, যখন তার হাইমেন ও যোনির ঘনত্ব অটুট থাকে। কেউ একজন তখনই ধর্ষিতা হতে পারেন, যখন তার পরীক্ষিত স্তন ঝুলে না-পড়ে, অর্থাৎ যদি শারীরিকভাবে বহু ব্যবহারের সামাজিক অর্থ নিজের স্তনে তিনি বহন না-করে থাকেন। কেউ একজন যদি বেশ্যা না-হয়ে থাকেন কিংবা বিচার প্রক্রিয়ায় যদি কোনোভাবে অভিযুক্ত ধর্ষকপক্ষ তাকে বহুগামী যৌনসম্পর্কে সম্পর্কিত 'মন্দ নারী' বা 'বেশ্যা' হিসেবে প্রমাণ করতে না-পারে, কেবল তখনই তিনি নারী হিসেবে ধর্ষিত একথা প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ বিচারকক্ষে পেলেও পেতে পারেন। বিবাহিত নারীর ধর্ষণ, পায়ুধর্ষণ, শিশুধর্ষণ— এই বিষয়গুলো সমাজের কাঙ্ক্ষিত ধর্ষণের চেহারার মধ্যে নেই। আর তাই ধর্ষণের মতো একটি রাজনৈতিক আইনি বিষয় ৬ বছরের শিশু, ৮ বছরের শিশুর মেডিক্যাল সনদের পরিপত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার মোড়কে 'হেবিচুয়েট টু সেক্স' মন্তব্য নিয়ে হরদম হাজির হয়। সমাজের কাঙ্ক্ষিত ধর্ষিতার চেহারা, তার সাথে সাথে বিতর্কিত ধর্ষণকেও, মেডিক্যাল এভিডেন্স বৈজ্ঞানিক পন্থায় টু ফিঙ্গার টেস্ট ও তার পরীক্ষিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে বারবার সমাজকাঙ্ক্ষিত চেহারায় আকৃতি দেয়, উপস্থিত করে এবং প্রতিষ্ঠা করে চলে।

মোদ্দাকথা দাঁড়ায়, ধর্ষণ মামলার মেডিক্যাল সনদের সামগ্রিক পদ্ধতিগুলো ধর্ষিতা নারীর অতীত যৌন আক্রমণ, হয়রানি এবং নির্যাতনের ইতিহাস নয়, বরং নারীর অতীত যৌন ইতিহাস দেখতে আগ্রহী। নারীর যৌনজীবন ও চর্চার প্রতি ভীষণরকমভাবে পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এই বিজ্ঞান বিচারের পরিসরে ভিকটিম নারীর চরিত্র বিশ্লেষণের একটি রাষ্ট্রীয় আইনগত কৌশল হিসেবে কাজ করে; এবং নারী তার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে তার বিদীর্ণতার বিরুদ্ধে আইনি চর্চাকে কার্যকর হতে দেখে। নারীর ধর্ষণ অভিজ্ঞতার অবমূল্যায়ন, তার অসম্মতিকে সম্মতিতে নির্ধারণ, অসম্মতিকে বিতর্কিত করে তোলা, এ সবকিছুই নারীশরীরের পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা প্রতিষ্ঠার একটি সামাজিক পদ্ধতি ও কৌশল হিসেবে কাজ করতে থাকে। নিশ্চুপকৃত হয় নারীর স্বর। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার ক্ষমতার মাধ্যমে নারীর যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলে। আর সর্বোপরি, এটি পুরুষালি মতাদর্শ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে কাজ করে চলে।

---

[৮] ধর্ষণ আমার কাছে কেবল নারীর যোনিতে শিশ্নের উপস্থিতি এবং প্রবেশের অসম্মতি নয়। ধর্ষণ আমার কাছে লিঙ্গীয় পরিচয় ধারণকারী শরীরের যেকোনোরকম মানসিক ও শারীরিক কাজের অসম্মতির প্রকাশ, যে অসম্মতি একজন মানুষ (তিনি সমাজের যে লিঙ্গীয় পরিচয়ই বহন করেন না কেন, তিনি নারী হোন কি পুরুষ কিংবা তৃতীয় লিঙ্গ) যেকোনো সময়ে, যেকোনো সম্পর্কে এমনকি জীবনের যেকোনো প্রেক্ষিতে প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখেন। সে অসম্মতি হতে পারে পায়ুকামে, সে অসম্মতি হতে পারে মুখকামে। আমার অসম্মতি থাকতে পারে আমার সামনে থাকা কোনো যৌন আমন্ত্রণের প্রতি, সে অসম্মতি আমি প্রদর্শন করতে পারি শিশু বয়সে, যৌন-অযৌন যেকোনোরকম শরীর ধারণকারী মানুষ হিসেবে আমি সে অসম্মতি যেকোনো সময় আমার যৌনসঙ্গীর ক্ষেত্রেও (এমনকি নারী হিসেবে আমার বিবাহিত পুরুষের সাথে এমনকি একজন পুরুষও তার বিবাহিত নারী সঙ্গীর প্রতি) প্রদর্শন করতে পারি, এমনকি 'লাশ' হিসেবেও আমার অসম্মতি প্রকাশের জায়গা আছে।

এই ভীষণ নারীবিদ্বেষী মেডিকো-আইনি বাস্তবতায় একজন নারী হিসেবে এবং একজন নৃবিজ্ঞানী হিসেবে আমি আসলে সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করছি, যেদিন বিচারকক্ষে মেডিক্যাল এভিডেন্স হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ধর্ষণের সার্ভাইভার নারী জোর গলায় এই প্রশ্ন করতে পারবে— আমার ছেঁড়া হাইমেন আর ঢিলা যোনিপথ থাকার সাথে যৌনকাজে অসম্মতি প্রকাশের সম্পর্কটা কী?

এই প্রবন্ধের আদি ভার্সন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে গবেষণাপত্র হিসেবে পঠিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে শীঘ্রই প্রকাশিতব্য 'আইডিয়াস অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইন ডেভেলপমেন্ট : এনথ্রোপলজিক্যাল পারসপেকটিভ' পুস্তকে পঠিত প্রবন্ধটি 'কনটেসটেড ডিসেন্ট'[৯] শিরোনামে ছাপা হচ্ছে। গবেষণায় ব্যবহৃত অভিজ্ঞতার বয়ানগুলো আমাকে শোনানোর জন্য আমি সে সব সার্ভাইভার নারীর প্রতি সম্মান দেখাতে চাই এবং বলতে চাই, আপনারা না-থাকলে কখনোই আমি 'আমি' থাকতাম না। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্লাস্ট, বিএনডব্লিউএলএ এবং নারীপক্ষকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাদি প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। চিকিৎসক, উকিল এবং বিচারক, যাঁরা তাঁদের মূল্যবান কাজ থেকে অবসর বের করে আমাকে সময় দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ। আর আমার অশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ শিক্ষক মির্জা তাসলিমা সুলতানা, মানস চৌধুরী, হেলাল উদ্দীন খান আরেফিন এবং আইনুন নাহারের প্রতি তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার জন্য। প্রবন্ধের সকল ভুল ও অযথার্থতার দায় একান্ত লেখকের নিজস্ব।

ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। fatama.suvra@gmail.com

তথ্যসূত্র

- Adler, Z., (1987) *Rape on Trial*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Brownmiller, S, 1976, *Against Our Will,* Harmondsworth, penguin.
- Connolly, William, 1993, The Terms of Political Discourse, Wiley.
- *Dignity on Trial: India's Need for Sound Standards for Conducting and Interpreting Forensic Examinations of Rape Survivors*, Human Rights Watch, 2010.
- Foley, Marian, Jo, 1996 (1997), *Who is in control?: Changing responses to women who have been raped and sexually abused,* In Radford, J., Kelly, L., and Hester, M., (eds), *Women, violence and male power*, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
- Foucoult, Michel, 1979, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York, Random House.
- Gillespie, Terry, 1996(1997), *Rape crisis centres and 'male rape': a face of the backlash,* In Radford, J., Kelly, L., and Hester, M., (eds), *Women, violence and male power*, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
- Ginsberg, E. and Lerner, S (1989) *Sexual Violence against Women: A Guide to the Criminal Law, London: Rights of Women Publication.*
- Grubin, D, and Gunn, J., 1990, *Imprisoned Rapists and Rape*, London: Home Office Research Unit.
- Holmstrom, L. and Burgess, A., 1978, *The Victim of Rape: Institutional Reaction*, New York: Wiley.
- Jeffreys, s. and Radford, J. (1984) *Contributing negligence: Being a woman,* In P. Scarton and P. Gordon (eds) *Causes for Concern*, Harmondsworth: Penguin.

[৯] Suvra, Fatama, forthcoming, *Contested Dissent: Social Crisis Related to the Collection and Use of Medical Evidence in Rape Trials, in Ideas and Practices in Developement: Anthropologial perspective, Department of Anthropology, Rajshahi University, Rajshahi.*

- Lees, Sue, 1996 (1997), *Unreasonable doubt: the outcomes of rape trials*, In Radford, J., Kelly, L., and Hester, M., (ed), *Women, violence and male power*, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
- M. Maguire, and M., Pointing, 1998, (eds), *Victims of Crime: A New Deal?*, Milton Keynes: open University Press.
- Mohanty, Chandra Talpade, 1991, *Cartographies of Struggle: Thirld World Women and the Politices of Feminism,* in Mohanty, C. T., Russo, A., Torres, Lourdes eds, *Thirld World Women and the Politics of Feminism,* Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Moran-Ellis, Jo, 1996 (1997), *Close to home: the experience of researching child sexual abuse*, In Radford, J., Kelly, L., and Hester, M., (eds), *Women, violence and male power*, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
- Panna, Shah Afroditi and Faustina Pereira. æRights of Women." *Human Rights in Bangladesh 2008*. Ed. Sara Hossain. Dhaka: Ain o Salish Kendra, 2009, p. 167. Web. http://www.askbd.org/web/?page_id=430>.
- Portelli, Alessandro, 1992, What makes oral history Differen, Perks, Robert, and Thomson, Alistair eds, *The Oral History Reader*, Routledge, London.
- Portelli, Alessandro, 1991, *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*, State University of New York Press.
- Rougerie , Sylvie McCallum, 2011, The Practical Challenges Related to the Collection and Use of Medical Evidence in Rape Trials in Bangladesh, BLAST.
- Schrager, Samuel, 1983, *What is social in oral history?* In Perils, Robert, and Thompson, Eliaster, ed, *The Oral History Reader*, Westport, Greenwood Publishing Group.
- Samuel, Raphael, 1983, *Perils of the transcript*, in Perils, Robert, and Thompson, Eliaster, ed, *The Oral History Reader*, Westport, Greenwood Publishing Group.
- Scully, D. (1990) *Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists,* London: Unwin Hyman.
- Stanley, L, 1992, *The Auto/Biographical I: Theory and Practice of Feminist Auto/ Biography, <amchester: Manchester University Press.*
- Temkin, J. 1987, *Rape and the Legal Process,* London: Sweet and Maxwell.
- Temkin, J. 1996, *Doctors, Rape and Criminal Justice,* Howard Journal of Criminal Justice: 35, 1-20.
- Walby, S, 1994, *Towards a Theory of Patriarchy*, in *The Polity Reader in Gender Studies-I*, U.K., Polity press.
- গুহঠাকুরতা, মেঘনা, ১৯৯৫, *নারীবাদী দৃষ্টিতে ধর্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন*, *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৫৮, ঢাকা, সনিকে প্রকাশনা।
- গুহঠাকুরতা, মেঘনা, ১৯৯৮, *সহিংসতা এবং নিপীড়ন : নারী আন্দোলনের প্রক্রিয়া*, *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৬৬, ঢাকা, সনিকে প্রকাশনা।
- মোসলেম, সীমা, ২০০৬, '*ধর্ষণচিত্র : ২০০০-২০০৪*', ঢাকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।
- শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০০৮, *অভিজ্ঞতায় ধর্ষণ : বহুমাত্রিক সহিংসতা ও নারী জীবনের পুনর্গঠন*, (অপ্রকাশিত) স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক গবেষণা থিসিস।
- শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা, ২০০৯, *আমি কী নারীবাদী? নারীর প্রতি সহিংসতা গবেষণার অভিজ্ঞতা*, নারী ও প্রগতি, সংখ্যা ৮, বর্ষ ৪, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৮ (পুনরায় প্রকাশিত *জেন্ডার ও যোগাযোগ*, প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ, জুন ২০১০, বাঙলায়ন প্রকাশনী)।
- শুভ্রা, *ফাতেমা সুলতানা*, ২০১০, *ভীষণ চেনা : সহিংসতাবিদ্ধ নারী (গবেষকের নারীর প্রতি সহিংসতা গবেষণা অভিজ্ঞতা)*, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ১১০, সেপ্টেম্বর ২০০৯, সনিকে প্রকাশনা।

– *শুভ্রা, ফাতেমা সুলতানা*, ২০০৯, *দাগের সংকট : সতী নারীর কেচ্ছা*, নারী ও প্রগতি, সংখ্যা ৯, বর্ষ ৫, জানুয়ারি-জুন ২০০৯।
– সুলতানা, মির্জা তাসলিমা, এবং ইসলাম, সাদাফ নূর-এ, ২০১১, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা : নারীবাদী দর্শনের সাম্প্রতিক সংকট ও উত্তরণ ভাবনা, আহমেদ রেহনুমা সম্পাদিত, পাবলিক নৃবিজ্ঞান : প্রবল ও প্রান্তিক ১, সন্ধি প্রকাশনী, ঢাকা।